শিল্প ও কৃষি সহ
সকল ঘরে সুলভে
পরিবেশবান্ধব
বিদ্যুৎ
কীভাবে সম্ভব?

সরকারের ব্যয়বহুল ঋণনির্ভর
পরিবেশবিধ্বংসী বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার বিপরীতে
জাতীয় কমিটির বিকল্প প্রস্তাবনা

তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

পুস্তিকা সম্পাদনা

মাহা মির্জা, মওদুদ রহমান, ড. সায়দিয়া গুলরুখ, মিজানুর রহমান,
মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, পূরবী তালুকদার, আনহা এফ খান

অক্ষর বিন্যাস

কৌশিক আহমেদ

প্রচ্ছদ

বাকী বিল্লাহ

মুদ্রণ

চিত্রকল্প প্রেস, ১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা ।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ দরকার এ দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য, অর্থনীতিকে গতি দেবার জন্য, জীবনকে স্বচ্ছন্দ করবার জন্য; দেশকে বিপদগ্রস্ত করবার জন্য নয়, মানুষ ও প্রকৃতির অপরিমেয় ক্ষতি করবার জন্য নয় । কিন্তু যখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে দেশকে বিপন্ন করবার আয়োজন হয়, ঋণ-নির্ভর, পরিবেশ বিধ্বংসী, ব্যয়বহুল প্রকল্পকে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের একমাত্র পথ হিসেবে উপস্থিত করা হয় তখন স্পষ্ট হয় যে, সরকারের প্রধান এজেন্ডা বিদ্যুৎ উৎপাদন নয় বরং বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে দেশি-বিদেশি কতিপয় গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ।

সরকার তার মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬) অনুযায়ী দেশ ধ্বংসী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সুন্দরবনবিনাশী রামপাল কেন্দ্র সহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয়বহুল, পরিবেশবিধ্বংসী, ঋণ-নির্ভর, বিপজ্জনক পথ গ্রহণ করছে। এর বিপরীতে কম দামে, পরিবেশবান্ধব উপায়ে, নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পথ সনাক্ত করে গত ২২ জুলাই জাতীয় কমিটি বিকল্প মহাপরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেছে। দুই দশকের আন্দোলনের উপর দাঁড়িয়ে, দুই বছরের গবেষণার মধ্য দিয়ে, জাতীয় কমিটি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে, শিল্প ও কৃষি সহ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য অনেক ভাল পথ আছে। সুন্দরবন বিনাশ, 'পারমাণবিক যুগে প্রবেশ' ইত্যাদির নামে দেশকে ধ্বংস ও মহাবিপদে ফেলা বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান বা উন্নয়নের পথ হতে পারে না ।

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান ও উন্নয়নের পথ নিয়ে জাতীয় কমিটির খসড়া প্রস্তাবনা দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংক্ষিপ্ত রূপে এই পুস্তিকায় প্রকাশ করা হল । জাতীয় কমিটির শরীক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞসহ সহযাত্রী সবাইকে অভিনন্দন জানাই । আমরা আশা করি, এই খসড়া নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে দেশ, মানুষ ও প্রকৃতি বান্ধব উন্নয়নের পক্ষে শক্তিশালী জনমত তৈরি হবে এবং তা জনস্বার্থের শক্তিকে বিকশিত করতে সহায়ক হবে ।

আনু মুহাম্মদ
সদস্য সচিব
তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি
২৬ আগস্ট ২০১৭

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
সরকারি মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬) এর বৈশিষ্ট্য	৫
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহার: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	৭
বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদ, সরকারের ভূমিকা ও করণীয়	১৩
বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল সম্পদের বর্তমান চিত্র	১৪
কয়লার মজুদ এবং ব্যবহারের ঝুঁকি	১৯
পারমাণবিক বিদ্যুৎ	২৩
কয়লা, এলএনজি এবং পারমাণবিক বিদ্যুতের অপ্রকাশিত খরচ	২৯
বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি: সম্ভাবনা ও প্রশ্নসমূহ	৩৩
বিভিন্ন জ্বালানির তুলনামূলক খরচ	৪১
সৌর-পানি-বায়ু শক্তি হতে শত ভাগ জ্বালানি চাহিদা পূরণে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা	৪৫
বাংলাদেশের জন্য জাতীয় কমিটির রূপরেখা	৪৮
সরকার ও জাতীয় কমিটির তুলনামূলক অবস্থান	৫১
বিনিয়োগ/ দাম: তুলনামূলক চিত্র	৫৩
নিরাপদ বৈষম্যহীন সমৃদ্ধির পথ যাত্রা	৫৪
অন্যান্য তথ্যসূত্র	৫৬
পরিশিষ্ট ১	৫৭
পরিশিষ্ট ২	৫৯

ভূমিকা

বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ গ্রীড বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে। যারা বিদ্যুৎ সংযোগের মধ্যে আছেন তারাও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। যারা সৌর বিদ্যুৎ (সোলার হোম সিস্টেম) ব্যবহার করছেন তাদের দিতে হচ্ছে অস্বাভাবিক উচ্চ দাম। মানসম্পন্ন বিদ্যুতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলেও নিয়মিতভাবে বাড়ছে বিদ্যুতের দাম। এই অবস্থা মোটেই শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বোপরি জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনুকূল নয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। ২০৪১ সাল নাগাদ তা প্রায় ২২ কোটিতে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সর্বক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। এর ফলে আগামী ২০৫০ নাগাদ বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে কয়েকগুণ। তাই সকল ঘরে সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এবং শিল্প ও কৃষির বাড়তে থাকা চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে যায় যে দেশি বিদেশি কিছু গোষ্ঠীর আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকলে দেশ ও জনগণের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করেই সর্বোচ্চ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সাজানো সম্ভব।

দেশের সম্পদ, সম্ভাবনা এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে আমরা এই বিকল্প মহাপরিকল্পনা উপস্থিত করছি। আমাদের এই মহাপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য:

১. দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুলভে নিরবচ্ছিন্ন এবং মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
২. দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করা ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার।
৩. সবার জন্য নিরাপদ, ঝুঁকিহীন এবং পরিবেশসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্দেশ করা।
৪. জাতীয় সক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামগ্রিক জীবনমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সরকারি মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬) এর বৈশিষ্ট্য

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য সরকার জাপানের জাইকার কনসালট্যান্টদের মাধ্যমে ২০৪১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা[১] (পিএসএমপি ২০১৬) উপস্থিত করেছে। এই 'মহাপরিকল্পনা'র বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

[১] Government of Bangladesh. Power Sector Master Plan 2016. Ministry of Power, Energy and Mineral Resources. September 2016

১. এটি বিদেশি তহবিল ও বিশেষজ্ঞ নির্ভর। দলিলের শেষে স্টাডি টিমের তালিকা এর প্রমাণ।[২] ইংরেজিতে প্রণীত এই দলিলে জাপানি ব্যবসায়িক সংস্থার যুক্ততাও স্পষ্ট। এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে: Japan Inter national Cooperation Agency (JICA), Tokyo Electric Power Services Company Limited, Tokyo Electric Power Company Holding, Inc.

২. এই 'মহাপরিকল্পনা'য় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, জনবসতি, সম্পদের আপেক্ষিক অবস্থান, জাতীয় সক্ষমতা, পরিবেশগত ঝুঁকি, আর্থিক সামর্থ্য এবং জনস্বার্থের প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

৩. এই 'মহাপরিকল্পনা' প্রণয়নের আগেই তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। **সরকারের বিভিন্ন নতুন প্রকল্পের তালিকা থেকে এটি নিশ্চিত যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।**

৪. এই 'মহাপরিকল্পনা' অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতের প্রতিটি প্রকল্পই হবে বিদেশি কোম্পানিভিত্তিক, আমদানি ও ঋণ নির্ভর। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৫. যথাযথ পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়াই জনসম্মতির বিরুদ্ধে অনিয়ম ও বলপ্রয়োগ করে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্পসহ প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রূপপুর প্রকল্পসহ ৭,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আমদানি করা এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকল্পকে যৌক্তিকতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. এই 'মহাপরিকল্পনা'য় দেশের স্থলভাগ এবং গভীর ও অগভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান বিষয়ে কোন পরিকল্পনা নেই। **এছাড়াও এতে দেশীয় গ্যাস সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক নীরবতার পাশাপাশি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সম্পূর্ণই আমদানিকৃত এলএনজি-র উপর নির্ভর করা হয়েছে। একদিকে দেশে গ্যাস সংকটের অজুহাত দিয়ে এলএনজি, কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বিদেশি কোম্পানির সাথে গ্যাস রপ্তানির বিধান রেখেই একের পর এক চুক্তি করা হচ্ছে।**

৭. একই কারণে মহাপরিকল্পনায় নিয়মিতভাবে গ্যাস ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে, **'এলএনজি আমদানি ও গ্যাসের আন্তর্জাতিক দাম বিবেচনায় প্রতিবছর ১৯ থেকে ২৯**

[২] GOB. "The Study for Master Plan on Coal Power Development in the People Republic of Bangladesh." PSMP 2016. Prepared by JICA. 2016. P. 7-26 11-33.

শতাংশ হারে গ্যাসের দামবৃদ্ধি করতে হবে' ।[৩]

৮. সারাবিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেলেও এই 'মহাপরিকল্পনায়' তার কোনো প্রতিফলন নেই। **বরং আন্তর্জাতিকভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যয় দ্রুতগতিতে কমে এলেও এই দলিলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই খাত উন্নয়নে উদাসীনতা দেখানো হয়েছে।**

৯. সরকারের মহাপরিকল্পনায় যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অনেকগুলোই দেশের সংবিধান ও দেশের আইন পরিপন্থী।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহার: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, কয়লা আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। এরপর ক্রমে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এসব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমে কয়লা বিদ্যুতের পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি দৃশ্যমান হওয়ায় বিকল্প নানা পদ্ধতির অনুসন্ধান বেড়েছে। বর্তমানে আমরা বিশ্বব্যাপী এক নতুন পর্বের মুখোমুখি হয়েছি যেখানে নবায়নযোগ্য উৎসসমূহ অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে একটি পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। আনুপাতিক হারে কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার কমে আসছে। পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ও বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন শর্ত আরোপিত হওয়ায় কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের জন্যেও কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। তারপরও বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানি ও পারমাণবিক ব্যবসার সাথে জড়িত বহুজাতিক পুঁজি এবং তাদের সহযোগীরা বিভিন্ন নতুন ধারার অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে এবং পুরনো বিপজ্জনক ধারাই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে 'গরীব'দেশে এসব পরিত্যক্ত প্রযুক্তি চাপিয়ে দেয়ার নানাবিধ অপচেষ্টা এখনও জোরদারভাবে চলছে। বাংলাদেশ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

বহু প্রতিবন্ধকতা ও লবিস্টদের তৎপরতা সত্ত্বেও বিশ্ব জুড়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একমাত্র এই ধারাটিই বিকাশমান, যেখানে কয়লা ও তেলসহ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রবণতা দ্রুত পড়তির দিকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ দ্রুত আরও বেশি ব্যয়সাশ্রয়ী হচ্ছে, প্রযুক্তিগত বিকাশও হচ্ছে দ্রুত। এর ফলে হাতে গোণা কিছু দেশ ছাড়া সব দেশই নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ফলশ্রুতিতে দেশে দেশে

[৩] GOB. "The Study for Master Plan on Coal Power Development in the People Republic of Bangladesh." PSMP 2016. Prepared by JICA. 2016. P. 7-26 11-33.

নীতিমালা পরিবর্তন করা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান ও দক্ষতা গড়ে তোলা হচ্ছে। ভারত ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সৌর জোট গঠন করেছে। ভারতের জ্বালানি গবেষক বিজ্ঞানী সৌম্য দত্তের মতে, **'যদি ভারত তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়, এমনকি লক্ষ্যের ৭০ শতাংশও অর্জন করতে পারে, তাহলে অন্তত আগামী ১৫ বছরের জন্য ভারতে কোনো কয়লা, পারমাণবিক বা বৃহৎ বাঁধনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজন হবে না**।[৪] ভারতের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারতের নতুন কোনো কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজন নেই।[৫] নিচের ছকের মাধ্যমে বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতির একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

ছক: বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং সিদ্ধান্ত

দেশ	সাম্প্রতিক ঘটনা/সিদ্ধান্ত
ভারত	• বর্তমানে ভারতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫০,০১৮ মেগাওয়াট (বাঁধভিত্তিক বিদ্যুৎ ছাড়াই)।[৬] ২০২২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে।[৭] • ২০২৭ সালের মধ্যে নতুন কোন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। • ২০২৭ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৬ লাখ ৫০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীতকরণের লক্ষ্য হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩ লাখ ৭২ হাজার মেগাওয়াট বা ৫৭ শতাংশ উৎপাদন হবে নবায়নযোগ্য ও দূষণমুক্ত অজীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। • ভারতের চতুর্থ ব্যস্ততম কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পুরোটাই চলছে সৌর বিদ্যুতে। ৪৫ একর জমির উপর স্থাপিত ১২ মেগাওয়াটের গ্রীড কানেক্টেড সোলার প্যানেল থেকে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পুরো চাহিদা মেটানোর পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বাড়তি বিদ্যুৎ আবার বিক্রিও করছে। ৬২ কোটি রূপী ব্যায়ে স্থাপিত এই উৎপাদন কেন্দ্রের খরচ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে ৬ বছরের মধ্যেই উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।[৮]

[৪] ভারতের বিজ্ঞানী সৌম্য দত্তের সাক্ষাৎকার। সর্বজনকথা, নভেম্বর ২০১৬.

[৫] Government of India. Draft National Electricity Plan. Central electricity Authority. Ministry of Power. December 2016

[৬] Government of India. Power Sector. January 2017. Central Electricity Authority. Ministry of Power. December 2016

[৭] Government of India. Draft National Electricity Plan. Central electricity Authority. Ministry of Power. December 2016

[৮] March 14, 2016, CNNMoney, http://money.cnn.com/2016/03/14/technology/india-cochin-solar-powered-airport/index.html

	• ভারতের বৃহত্তম কয়লা কোম্পানি আগামী বছরের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় বলে ৩৭টি খনি বন্ধ করে দিচ্ছে। **একই কারণে ১৪ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারত বন্ধ করে দিচ্ছে।**[৯]
চীন	• চীন ২০১৭ সালে নির্মানাধীন ১ লক্ষ ২০ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার ১০৪টি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে।[১০] বায়ু দূষণ মোকাবেলায় রাজধানী বেইজিংয়ের সবকটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[১১] • শুধুমাত্র কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দূষণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ২০১৩ সাল থেকে পরবর্তী ৫ বছরে ২৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১২] চীনের জন্য এই বিনিয়োগ তার প্রতিরক্ষা বাজেটেরও দ্বিগুণ। • **চীন ২০২০ সালের মধ্যেই আরও নতুন ১ লক্ষ ১০ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে।** • চীন নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ৩৬১বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ২০২০ সালের মধ্যেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।[১৩] • চীন কেবলমাত্র ২০১৬ সালেই ৩৪ হাজার মেগাওয়াটের সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। বর্তমানে চীনের মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭৭ হাজার মেগাওয়াট যা দেশ হিসেবে বিশ্বে সর্বোচ্চ।

[৯] June 21, 2017, independent.co.uk, http://www.independent.co.uk/ news/world/asia/coal-india-closes-37-mines-solar-power-sustainable- energy-market-influence- pollution-a7800631.html?cmpid=facebook-post

[১০] Energy Desk, Greenpeace. China suspends 104 planned coal power plants. January 16, 2017. http://energydesk.greenpeace.org/2017/01/16/china-coal-pow er-overcapacity- crackdown/, Independent. China scraps construction of 85 planned coal power plants. January 17, 2017. http://www.independent.co.uk/news/world/asia/chi na-scraps-construc tion- 85- coal-power- plants-renewable-energy-national-energy-administration-paris-a7530571.html

[১১] China Daily. Beijing's last large coal-fired power plant suspends operations. March 19, 2017. http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-03/19/content_28603569.htm

[১২] Mongabay. China pledges $275 billion over 5 years to cut record air pollution. August 19, 2013. https://news.mongabay.com/2013/08/china-pledges-275-billion- over- 5-years- to-cut-record-air-pollution/

[১৩] Grist. China plans to create 13 million clean energy jobs by 2020. January 5, 2017. http://grist.org/briefly/china-plans-to-create-13-million-clean-energy-jobs-by-2020/

	• নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বর্তমানে ১১ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে থাকা চীন ২০৩০ সালের মধ্যেই এই খাত হতে মোট প্রয়োজনের ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৪] • চীন সরকার ৪০ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার সবচেয়ে বৃহৎ ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পটি শুধু এ অঞ্চলের জমির পুর্ণব্যবহারই নিশ্চিত করছে না বরং এটি বন্যার ফলে জমির সংকট তৈরি হয়েছিল তাও হ্রাস করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।[১৫] • চীনে ৬০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত কিনহাই প্রদেশে ২০১৭ সালের জুন মাসের ১৭ হতে ২৩ তারিখ পর্যন্ত শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ সরবরাহের যে পরীক্ষা চালানো হয় তা সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে। এ সময়ে ১.১ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুতের পুরোটাই আসে সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুৎ হতে। হিসেবে দেখা যায় যে, এই পরিমাণ বিদ্যুতের যোগান দিতে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টন কয়লার প্রয়োজন হত।[১৬]
ডেনমার্ক	• ডেনমার্কে বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৪০ শতাংশই আসছে বায়ু বিদ্যুৎ থেকে, ২০২০ সালের মধ্যেই তা ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ সত্তরের দশকের আগ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই ছিল আমদানী করা তেল নির্ভর। • ডেনমার্ক ২০৫০ সালের ভেতর শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করছে।[১৭]
জার্মানি	**২০১৭ সালের ১৫ মে জার্মানির প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের প্রায় পুরোটাই নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়।[১৮]**

[১৪] June 2, 2017. inhabitat, http://inhabitat.com/china-is-now-the-largest-producer-of-solar-power-in-the-world/

[১৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ জুন, 2017 http://www.bd-pratidin.com/features/2017/06/05/237734

[১৬] June 27, 2017. independent, http://www.independent.co.uk/ news/ world/ asia/china- qinghai-province-renewable-energy-test-grid-sustainable-power-clean-technology- a7810496.html

[১৭] Denmark.DK. A WORLD-LEADER IN WIND ENERGY. November 2015. http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/

[১৮] Bloomberg. Germany Just Got Almost All of Its Power From Renewable Energy. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/germany-just-got-almost- all-of-its- power-from-renewable-energy

	• ২০১৬ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে জার্মানির মোট বিদ্যুতের ২৯.৫% উৎপাদিত হয়েছে ।১৯
নেদারল্যান্ড	• নেদারল্যান্ডে ২০১৭ সালের শুরু থেকেই সকল ট্রেন বায়ু বিদ্যুৎ দিয়ে চলছে ।[২০]
ফ্রান্স	• **ফ্রান্স ২০২৩ সালের মধ্যেই সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ।[২১]** • অপরদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খনন কোম্পানি পিবডি এনার্জি ২০১৬ সালে নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণা করেছে ।[২২]
যুক্তরাষ্ট্র	• বৈশ্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ও শেল এর মত তেল-গ্যাস ভিত্তিক বৃহদাকার কর্পোরেশনগুলোও ভবিষ্যতে নয়াবনযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে শুধুমাত্র সোলার এবং বায়ু বিদ্যুতেই এই কোম্পানিগুলো ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ।[২৩] • **ব্রিটিশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যেই সকল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।[২৪]**

[১৯] EnergyTransition. Renewable energy production stagnates in Germany in 2016. January 16, 2017. https://energytransition.org/2017/01/renewable-energy-production-stagnates-in germany-in-2016/

[২০] The Guardian. Dutch electric trains become 100% powered by wind energy. January 10, 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/jan/ 10/ dutch- trains-100-percent-wind-powered-ns

[২১] IFLscience. France To Shut Down All Its Coal Power Plants By 2023 . http://www.iflscience.com/environment/france- shut-down-coal-power-plants- 2023/

[২২] The Wall Street Journal. Peabody Energy Files for Chapter 11 Bankruptcy Protection. April 14, 2016. https://www.wsj.com/articles/peabody-energy-files-for-chapter- 11- protection-from-creditors-1460533760

[২৩] June 12, 2017. theguardian, https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/12/oil- giants-need-to-invest-heavily-in-renewables-by-2035-analysis-finds

[২৪] April 22, 2017. theguardian , https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/21/britain-set-for-first-coal-free-day-since-the-industrial-revolution

বাংলাদেশ	• দেশে বর্তমানে প্রতি কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সৌর প্যানেল স্থাপনে ব্যাটারিসহ ব্যয় হয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি ওয়াটের দাম পড়ে ১২০টাকা। অথচ ভারতে প্রতি ওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেলের মূল্য ৪১ টাকা, পাকিস্তানে ৯০ টাকা আর থাইল্যান্ডে ৮৬ টাকা।[২৫]

ছক: নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ঘোষিত ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা

ডেনমার্ক	২০২০ সালের মধ্যে মোট প্রয়োজনীয় জ্বালানির ৫০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগই আসবে নবায়নযোগ্য উৎস হতে।
সুইডেন	২০৪০ সালের মধ্যে সকল জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু হবে। উল্লেখ্য যে সেখানে ২০১৫ সালে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫৭ শতাংশ এসেছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে।[২৬]
জার্মানি	২০২৫ সালের মধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে। ২০৫০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত হবে।[২৭]
স্কটল্যান্ড	২০৩০ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ৫০ শতাংশ আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে।[২৮]
শ্রীলঙ্কা	**২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ এবং ২০৩৫ সালের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত হবে।[২৯]**

[২৫] ১৫ মার্চ, ২০১৭, বণিকবার্তা, 'সৌরবিদ্যুৎ এশিয়ায় সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাংলাদেশে'

[২৬] October 26, 2016. independent, http://www.independent.co.uk/ news/ world/ europe/sweden-renewable-energy-target-2040-country- on- track-a7381686.html

[২৭] May 5, 2017, independent, http://www.independent.co.uk/ news/ world/europe/germany-renewable- energy-record-coal-nuclear-power-energiewende-low-carbon- goals- a7719006.html

[২৮] January 24, 2017, bbc, http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-38729869

[২৯] Sri lanka Sustainable Energy Authority, http://www.energy.gov.lk/renewables/renewable-energy-resources/solar/solar-energy-targets, accessed on 22 Nov. 2017

ভারত	২০২২ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার সৌর, বায়ু, বায়োমাস এবং ছোট আকারের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া অজীবাশ্ম জ্বালানি খাত ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়ে ২০২৭ সালের মধ্যেই ৫৭ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষনা দেয়া হয়েছে।[৩০]
বাংলাদেশ	সরকার প্রণীত বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬) তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ৭ টেরাওয়াট-আওয়ার যা ২০৪১ সালের মোট প্রাক্কলিত উৎপাদনের ৩ শতাংশ। নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে কেবল বায়ু বিদ্যুতেই বাংলাদেশের সম্ভাবনা রয়েছে ২০ হাজার মেগাওয়াটের (অন্যান্য তথ্যসূত্রে দেখুন সাইফুল্লাহ ও অন্যান্য ২০১৬)। এছাড়াও বলা হয়েছে ২০৪১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ বিদ্যুৎ আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কিংবা আমদানি করা বিদ্যুতের মাধ্যমে। একই মহাপরিকল্পনায় আমদানি করা বিদ্যুতের যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করা হয়েছে তা পূরণ হয়ে গেলে এই নীতিমালা অনুসারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে শূন্য।

বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদ, সরকারের ভূমিকা ও করণীয়

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ বিপুল পরিমাণে না থাকলেও যতটুকু আছে তার সর্বোত্তম ব্যবহার কখনোই সম্ভব হয়নি। আশির দশক থেকে বিভিন্ন ভুল নীতি ও দুর্নীতির অংশ হিসেবে বহু ক্ষতিকর চুক্তি হয়েছে। ফলে দেশের সম্পদ ক্রমাগত বিপদ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। অথচ আমাদের গবেষণা অনুযায়ী জাতীয় সংস্থার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত না করলে রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান ও উত্তোলনের মাধ্যমেই বাংলাদেশের গ্যাস সংকট দূর করা সম্ভব হতো, আবার বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের খরচও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেত।[৩১]

[৩০] Ministry of New and Renewable Energy, India, http://www.mnre.gov.in/, accessed on 22 Nov. 2017

[৩১] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন মোস্তফা, কল্লোল: "বাপেক্স যেভাবে জাতীয় মালিকানায় সাগরের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের দায়িত্ব নিতে পারে।" সর্বজনকথা, ৩ বর্ষ সংখ্যা ১, নভেম্বর ২০১৬

সত্তরের দশক পর্যন্ত জ্বালানি সম্পদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে। বিশ্বের শতকরা ৮৫ ভাগ তেলসম্পদ তাদের দখলেই ছিল। কিন্তু বর্তমানে জ্বালানি সম্পদের মালিকানার চিত্র পাল্টাচ্ছে। গত চার দশকে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ তাদের জাতীয় সংস্থার বিকাশ ঘটিয়েছে। স্থানীয় খনিজ সম্পদের ওপর নিজস্ব মালিকানা তাদের উন্নয়ন নীতির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। **সর্বশেষ হিসেবে বিশ্বের শতকরা ৭৩ ভাগ তেলসম্পদ এখন বিভিন্ন দেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার মালিকানায় উত্তোলিত হয় এবং উত্তোলনের শতকরা ৬১ ভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে।**[৩২]

বাংলাদেশের শাসকদের 'রোডম্যাপ' বরাবরই উল্টো দিকে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা মালয়শিয়ার পেট্রোনাস এবং নরওয়ের স্টেট অয়েল এর সমবয়সী। অথচ পেট্রোনাস ও স্টেট অয়েল ইতোমধ্যেই বিশ্বপর্যায়ে কাজের সক্ষমতা অর্জন করেছে। **অন্যদিকে ভারতের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ওএনজিসি তার প্রতিষ্ঠার ১৭ বছরের মাথাতেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের সক্ষমতা অর্জন করেছে। অথচ প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পার হয়ে গেলেও পেট্রোবাংলাকে নিজের সক্ষম ভিত্তি দাঁড় করাতে দেয়া হয়নি।** বরং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থাগুলোর 'অক্ষমতা'র অজুহাতে, লুণ্ঠন ও দুর্নীতির বিভিন্ন প্রকল্পের ঢালাও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পুঁজির অভাবের যুক্তি দিয়ে স্থল ও সমুদ্র ভাগের বিশাল সম্ভাবনাময় গ্যাস ব্লকগুলোকে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ফল স্বরূপ, ১০ থেকে ৩০ গুণ বেশি দামে গ্যাস কিনতে হচ্ছে। 'পুঁজি নেই' বলে এসব চুক্তি করা হলেও প্রয়োজনীয় পুঁজির চাইতেও বহুগুণ বেশি অর্থ প্রতি বছরেই বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ভর্তুকি হিসেবে দেয়া হচ্ছে। এতে ঋণগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি, বারবার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। এসব অনৈতিক কর্মকান্ডকে আইন-আদালতের উর্ধ্বে রাখার জন্য সরকার প্রণয়ন করেছে দুর্নীতির দায়মুক্তি আইন। ফলে এই বিপুল সম্ভাবনাময় গ্যাস সম্পদ দেশের কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল সম্পদের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশের স্থলভাগে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত অবশিষ্ট আছে ১৩.৬০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)।[৩৩] উল্লেখ্য,

[৩২] For detail analysis of the present situation see, David G. Victor, David R. Hults and Mark C. Thurber (Edited): Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy Supply, Cambridge University Press, 2014

[৩৩] PetroBangla. Petrobangla Annual Report 2015. Government of Bangladesh. p. 62.

বর্তমানে বাংলাদেশে বার্ষিক গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ প্রায় ১ টিসিএফ। অর্থাৎ নতুন কোন গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন যুক্ত না হলে ২০১৮ সালের পর থেকে গ্যাসের সরবরাহ কমতে শুরু করবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকে এটা নিশ্চিত যে, গভীর ও অগভীর সমুদ্র ব্লকগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস সম্পদ আছে। **২০০১ সালে ইউএস জিএস ও পেট্রোবাংলার এক যৌথ নিরীক্ষণে বাংলাদেশের স্থলভাগ এবং অগভীর সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত মোট ৩২ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল।**[৩৪]

সম্প্রতি বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমানা সংলগ্ন আরাকান বেসিনে ৯ টিসিএফ গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৫] একই ধরনের ভূতাত্ত্বিক গঠনযুক্ত (জিওলজিক্যাল ফোল্ড) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে পরিচালিত সকল জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের সমুদ্র ব্লকগুলোতে হাইড্রোকার্বনের বিশাল মজুদ এখনো অনাবিষ্কৃত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গভীর সমুদ্রের DS-12, DS-16, DS-21, DS-25 ব্লকগুলোতে গ্যাসের বড় মজুদ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।[৩৬]

বর্তমানের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য মজুদের সাথে গভীর ও অগভীর সমুদ্রের অনাবিষ্কৃত গ্যাসের মজুদ যুক্ত হলে সব মিলিয়ে ৫০ ট্রিলিয়ন ঘটফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা অলীক নয়। তবে তার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ আবশ্যক।

বাপেক্সের সক্ষমতা ও সংকট

বাংলাদেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার পূর্বসূরি পেট্রোবাংলার অধীনে নিযুক্ত জনবল, যন্ত্রপাতি ও ক্ষতির দায়ভার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। শুরু থেকেই বাপেক্সের আয়, স্থায়ী খরচ,

[৩৪] PetroBangla. Final Updated Report on Bangladesh Petroleum potential and resource Assessment 2010. Hydrocarbon Unit and Energy and Mineral Resource Division. Government of Bangladesh. June 2011.
USGS-Bangladesh Gas Assessment Team. U.S. Geological Survey–PetroBangla Cooperative Assessment of Undiscovered Natural Gas Resources of Bangladesh. U.S. Geological Survey Bulletin. August 19, 2001.

[৩৫] Filipov, Allan; Dilindi, Robert; Drage, Magne. Electro-Magnetic Sensitivity in the Bengal Basin: Implications for Exploration in Mynmar, Bangladesh and NE India. International Petroleum Technology conference. 10-12 December. Malaysia.

[৩৬] Imam, Badrul."Energy Resources of Bangladesh".The University Grants Commission of Bangladesh. January 2013. p. 142. Ges লেখকের সাথে দলগত আলোচনা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অনুসন্ধান ও খনন খরচ সবকিছুই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। বাপেক্সকে তার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারের চরম গাফিলতি দেখা গেছে।

বাপেক্সের সাফল্যের হার

দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার অজুহাতে বারবার বিদেশি কোম্পানিকে ডেকে আনা হলেও কূপ খনন ও গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির সাফল্যের অনুপাতের (৪:৫:১) তুলনায় বাপেক্সের সাফল্যের অনুপাত (১:৬:১) অনেক ভালো।

নির্ভরযোগ্যতা

অক্সিডেন্টাল ও নাইকোর মতো 'উন্নত প্রযুক্তি'র কোম্পানিগুলোই মাগুরছড়া ও টেংরাটিলার মতো পরিবেশ ও সম্পদ বিনাশী দুর্ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সীমিত সম্পদ ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করলেও **বাপেক্সের হাতে কখনো এ ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেনি**। একইভাবে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডের মতো তড়িঘড়ি করে ক্যাপাসিটির বেশি গ্যাস উত্তোলন করতে গিয়ে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আহরণের অনেক আগেই গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করার রেকর্ডও বাপেক্সের নেই।

বহুজাতিকের সাবকন্ট্রাক্টর হিসেবে কার্যক্রম

বাপেক্স তার সীমিত প্রযুক্তি দিয়েই সার্ভিস কন্ট্রাক্টের আওতায় বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির সাব-কন্ট্রাক্টিং এর কাজ করে দিচ্ছে। যেমন:

- ফেনী-২ এ নাইকোর একটি অনুসন্ধান কূপ খনন,
- তাল্লোর হয়ে লালমাই ও বাঙ্গোরায় সিসমিক সার্ভের কাজ,
- চাঁদপুরে কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন এবং
- বাঙ্গোরায় তাল্লোর একটি কূপ (ওয়ার্কওভার) খনন।

কম খরচ

পিএসসি চুক্তির মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন করা হলে উত্তোলিত গ্যাসের একটি বড় অংশের মালিকানা বিদেশি কোম্পানির হাতে চলে যায় এবং নিজেদের গ্যাস বিদেশি কোম্পনির কাছ থেকে কয়েকগুণ বেশি দামে কিনতে হয়। **অথচ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন করা হলে একদিকে গ্যাসের মালিকানা জনগণের হাতে থাকত, অন্যদিকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের খরচও কম হতো**। উদাহরণস্বরূপ,

- শ্রীকাইল-৪ কূপ খননের জন্য বাপেক্সের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৪ কোটি

৫০ লাখ টাকা। **অথচ একই কূপ খননে রাশিয়ার গ্যাজপ্রম ব্যয় দেখিয়েছে ২৫০ কোটি ৭৩ লাখ টাকা, অর্থাৎ বাপেক্সের প্রায় চার গুণ।**

- এর আগে 'ফাস্ট ট্র্যাক' প্রোগ্রামের আওতায় গ্যাজপ্রমকে দিয়ে যে ১০টি কূপ খনন করানো হয় সেখানে কূপ প্রতি ব্যয় ছিল ১৯.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১৫৪ কোটি ৮ লাখ টাকা, অর্থাৎ বাপেক্সের ব্যয়ের দ্বিগুনেরও বেশি।
- প্রতি কিলোমিটার লাইনের সিসমিক সার্ভের জন্য বিদেশি কোম্পানিকে যেখানে গড়ে ৬ লাখ ৫৩ হাজার টাকা করে খরচ দিতে হয় সেখানে বাপেক্সের গড়ে খরচ হয় ১ লাখ টাকা করে।

অপর্যাপ্ত, বিলম্বিত ও আংশিক বরাদ্দ

বাপেক্সকে তার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারের চরম গাফিলতি দেখা গেছে। ১৯৯৮ সালে বাপেক্স নতুন একটি রিগ কেনার জন্য 'অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেনদেনিং' নামের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে। কিন্তু পরবর্তীতে শুধুমাত্র গাফিলতির কারণে দফায় দফায় দরপত্র আহ্বান করে ও বাতিল করে অবশেষে ২০০৯ সালে ২৫৬ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট সহ একটি চীনা কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। মোবারকপুর তেল-গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্পটি ২০০১ সালে বাপেক্সের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হলেও একনেকে এটি প্রথমবার অনুমোদিত হয় ২০০৬ সালে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হয় ২০১০ সালে। এভাবে বাপেক্সের প্রায় প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত, বিলম্বিত ও আংশিক বরাদ্দ দেয়া হয়, যার ফলে সময়মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

বিদেশি কোম্পানির তুলনায় কম অগ্রাধিকার

বাপেক্স সম্প্রতি ২০২১ সালের মধ্যে ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১০৮টি কূপ খননের একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। **সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাপেক্সের এই প্রশংসনীয় বিশেষ উদ্যোগে সহযোগিতা করার বদলে উল্টো বাপেক্সের পরিকল্পিত কূপ খননকাজের উল্লেখযোগ্য অংশ রাশিয়ার কোম্পানি গ্যাজপ্রমের হাতে তুলে দিয়েছে।** উল্লেখ্য, প্রকল্পের কাজে কারিগরি ত্রুটি ও অধিক অর্থ ব্যয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে গ্যাজপ্রমের। শুধু তাই নয়, বাপেক্সের কাজ গ্যাজপ্রমের হাতে তুলে দেয়ার বিরোধিতা করায় বাপেক্সের এমডি মো. আতিকুজ্জামানকে বাপেড থেকে সরিয়ে দেয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটেছে (সূত্রঃ বণিকবার্তা, ২০ নভেম্বর, ২০১৬)।

সক্ষমতা বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা না থাকা

বলা হচ্ছে যেহেতু সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের দক্ষতা বাংলাদেশের নেই, তাই গ্যাসের বেশির ভাগ মালিকানা ও রফতানির সুযোগ দিয়ে বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। সমুদ্রের ২৮টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বাপেক্সের সার্বিক দক্ষতা অর্জনের উদ্যোগ এত দিনেও কেন নেয়া হল না এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, এ ধরনের যুক্তি দিয়েই সম্প্রতি রফতানির বিধান রেখে গভীর সমুদ্রের ১২ নম্বর গ্যাস ব্লক থেকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য কোরীয় কোম্পানি দাইয়ুর সঙ্গে পিএসসি অনুস্বাক্ষর করেছে পেট্রোবাংলা। এটি করা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন দেশে তীব্র গ্যাস সংকট চলমান।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার, **তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জাতীয় সক্ষমতা অর্জনের জন্য সেমি সাবমার্জিবল রিগ বা সাপোর্ট ভেসেল তৈরির প্রয়োজন বাংলাদেশের নেই। এগুলো ক্রয় করে কিংবা ভাড়া করে ব্যবহার করেও তেল-গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনে সক্ষমতা অর্জনের কাজটি শুরু করা যায়।** বাংলাদেশ এ পর্যন্ত যেসব বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছে তারাও বিদেশি কন্ট্রাক্টর ভাড়া করেই কাজ করছে। যেমন: অগভীর সমুদ্রের ১৬ নং গ্যাস ব্লকে অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি সান্তোস নিজস্ব রিগ দিয়ে খনন কাজ করেনি, তারা নেদারল্যান্ডের কোম্পানি সিড্রিলের কাছ থেকে রিগ ভাড়া করে এনেই অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজটি করেছে। কনোকোফিলিপসের হাতে সাগরের ১০ ও ১১ নং ব্লক তুলে দেয়া হয়েছিল। এই কোম্পানিটিও রিগ ভাড়া করেই কাজ করে। যেমন, বিশ্বের মোট ১৮টি স্থানে তারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কাজ পরিচালনা করছে (অপারেটর হিসেবে) যার ১২টিতেই কাজ করছে বিভিন্ন সাবকন্ট্রক্টর কোম্পানি। বাংলাদেশের ১০ ও ১১ নং ব্লকে দ্বিমাত্রিক সিসমিক সার্ভেও কনোকোফিলিপস করিয়েছে চীনা কন্ট্রাক্টর বিজিপিকে দিয়ে। কাজেই বাপেক্সের পক্ষেও প্রয়োজনীয় সার্ভিস এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে রিগ ও যন্ত্রপাতি ভাড়া করে, গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন বিষয়ে যথাযথ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এ ধরনের তদারকির কাজ করাটা অসম্ভব কোনো বিষয় নয়।

জাতীয় কমিটি দীর্ঘদিন ধরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জাতীয় সংস্থার দুর্বলতা সম্পর্কে প্রচলিত প্রচার প্রচারণার বিপক্ষে তাদের যুক্তি তর্ক তুলে ধরেছে। সক্ষমতা বিকাশের নীতি গ্রহণ করলে এই সংস্থাই গভীর ও অগভীর সমুদ্রের গ্যাস উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে সক্ষম হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যথাযথ নীতিগ্রহণ করলে ২০৪১ সাল পর্যন্ত দেশের গ্যাস চাহিদা নিজেদের গ্যাস

থেকেই মেটানো সম্ভব।

সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা

- গ্যাস নিয়ে রপ্তানিমুখি চুক্তি বাতিল করতে হবে।
- দেশের অভ্যন্তরে এবং উপকূলে অবস্থিত গ্যাস ব্লকগুলোর অনুসন্ধান ও উৎপাদনকাজ শুধু বাপেক্সের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে।
- বাপেক্স ও পেট্রোবাংলাকে আরো দক্ষ ও শক্তিশালী করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে **স্থলভাগের মতো গভীর সমুদ্রেও দেশীয় কোম্পানিগুলো নিজেরাই তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কাজ চালাতে পারে**। মধ্যবর্তী সময়টুকুতে একটি বা দুটি ব্লক থেকে কাজ চালানোর মতো গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাপেক্সের কর্তৃত্বাধীনে দেশী-বিদেশি কন্ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি ভাড়া করা যেতে পারে।
- বাপেক্সের জন্য প্রয়োজনীয় রিগ ও অন্যান্য সরঞ্জাম অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।
- বাপেক্সের কারিগরি জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশ-বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাজেটে বাপেক্সের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। অহেতুক সময়ক্ষেপন বন্ধ করতে হবে। বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি বরাদ্দ করার সুযোগ দিতে হবে।
- গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন নিয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকতে হবে। **লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সময়মতো প্রয়োজনীয় রিগ ও যন্ত্রপাতি কিনতে হবে, অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে, লোকবল নিয়োগ ও দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হবে।**

কয়লার মজুদ এবং ব্যবহারের ঝুঁকি

এখন পর্যন্ত জানা মতে, বাংলাদেশে ৫টি কয়লাখনিতে প্রায় ৩ বিলিয়ন টন কয়লার মজুদ আছে। তবে এর অর্ধেক আছে জামালগঞ্জ খনিতে যেখানে বর্তমানে প্রাপ্ত প্রযুক্তির কোনটি দিয়েই কয়লা খনন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ (জিএসবি) ১৯৮৫ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি আবিষ্কার করে। ২০০৪ সালে পেট্রোবাংলা চীনের একটি কোম্পানির সঙ্গে সাবকন্ট্রাক্টর নিয়োগের চুক্তি করে। পরের বছর থেকে এই খনির কার্যক্রম শুরু হয়। ৯০ এর দশকের শুরু থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খনি কোম্পানিগুলো এই অঞ্চলে ব্যবসার সম্ভাবনা খুঁজতে শুরু করে।

কয়লা বিরোধী আন্দোলন এবং ফুলবাড়ী চুক্তি

ফুলবাড়ী কয়লাখনি অনুসন্ধানের প্রাথমিক বিশ্লেষণেই দেখা যায়, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবাদি জমি, পানিসম্পদ ও জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পুরো উত্তরবঙ্গই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হবে। আবার চুক্তি অনুযায়ী কয়লাসম্পদও দেশের কাজে লাগবে না। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা – সবকিছুই বিপর্যস্ত হবে। খুবই যৌক্তিক কারণে এই প্রকল্প ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। উন্মুক্ত কয়লাখনি, বিদেশি কোম্পানি ও রপ্তানির বিরুদ্ধে এই শক্ত অবস্থানের মূল কারণ ছিল: ১) ১৫০টি গ্রামের প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করা হতো শুধুমাত্র একটি খনির কারণে। **২) খনি এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ফলে শুধু বৃহৎ জলাধারগুলোই (অ্যাকুইফার) ক্ষতিগ্রস্ত হতো না, এতে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের অধিকাংশ জলাধারই শুকিয়ে গিয়ে ওই এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হতো**। ৩) খনি এলাকার বাইরের বিশাল এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেত। এই কৃষিপ্রধান এলাকা দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহে বড় ভূমিকা রাখায় উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি দেশের খাদ্য ও পরিবেশ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াত। ৪) রপ্তানিমুখী চুক্তির কারণে কয়লা সম্পদ চলে যেতো বিদেশে, অপরদিকে বাংলাদেশ সেই কয়লার ন্যায্য দামও পেত না।

এই ভয়াবহ প্রকল্প বাতিলের দাবীতে ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট জাতীয় কমিটি আহূত বিশাল গণজমায়েতের ওপর বিডিআর বাহিনী গুলি চালায়। তিনজন শহীদ হন এবং শত শত লোক আহত হন। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সরকার ৩০ আগস্ট 'ফুলবাড়ী চুক্তি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে। চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল: ১) ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প বাতিল করতে হবে এবং এশিয়া এনার্জি দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে। ২) দেশের কোথাও উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি অনুমোদন করা হবে না। ৩) খনন পদ্ধতি এবং কয়লা উন্নয়ন ও ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোন ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে জনগণের মতামত নিতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

গণরায় উপেক্ষা করে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশে জনবসতি আর ফসলি জমি ধ্বংস করে কয়লা উত্তোলনের বিপক্ষে গণরায় থাকা সত্ত্বেও ২০৪১ সালের মধ্যে প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সরকারের এই পরিকল্পনা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশীয় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা হবে ৬ হাজার ২০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে। আরও বলা হয়েছে যে এই কেন্দ্রগুলো চালাতে বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা দেশের অভ্যন্তরের খনি থেকে

উত্তোলন করা হবে, আর ৬ কোটি মেট্রিক টন আমদানি করা হবে।

কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চাকরীর প্রলোভন

একটি ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে সর্বোচ্চ ৪,০০০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন এবং পরিচালনা করতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৬০০ কর্মসংস্থান হতে পারে। এর বিপরীতে দেখা যায় এলাকার স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান হারানোর এক ভয়াবহ চিত্র। উদাহরণস্বরূপ, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকার কথা উল্লেখ করা যায়। ১,৩২০ মেগাওয়াটের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপন করতে ১,৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। **উচ্ছেদ করা হয়েছে ২,০০০ দরিদ্র পরিবারকে**। পরিবেশ সমীক্ষা অনুসারে, প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ৯৫ শতাংশই কৃষি জমি ও চারপাশের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ৭৫ শতাংশই কৃষি জমি (সূত্রঃ রামপাল ইআইএ, পৃষ্ঠা -১৩৫, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮ ও ২০৪)। প্রস্তাবিত এলাকায় বছরে উৎপাদিত ফসল ও মাছের বিবরণ নিচে দেয়া হলঃ

- প্রকল্প এলাকায় ১২৮৫ টন ধান উৎপাদিত হয়; ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ৬২,৩৫৩ টন ধান উৎপাদিত হয়।
- ধান ছাড়াও বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বছরে ১,৪০,৪৬১ টন অন্যান্য শস্য উৎপাদিত হয়।
- প্রতি বাড়িতে গড়ে ৩/৪টি গরু, ২/৩টি মহিষ, ৪টি ছাগল, ১টি ভেড়া, ৫টি হাস, ৬/৭টি করে মুরগি পালন করা হয়।
- ম্যানগ্রোভ বনের সাথে এলাকার নদী ও খালের সংযোগ থাকায় এলাকাটি স্বাদু ও লোনা পানির মাছের সমৃদ্ধ ভান্ডার। জালের মতো ছড়িয়ে থাকা খাল ও নদীর নেটওয়ার্ক এই এলাকার জীববৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে বছরে ৫২১৮.৬৬ মেট্রিক টন এবং প্রকল্প এলাকায় ৫৬৯.৪১ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশ সমীক্ষাতেই স্বীকার করা হয়েছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে প্রকল্প এলাকায় ধান, মাছ, গৃহপালিত পশুপাখি ইত্যাদির উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে (সূত্রঃ রামপাল ইআইএ, পৃষ্ঠা- ২৬৬ ও ২৬৭)। আবার ভারত, চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে স্থানীয় শস্য উৎপাদন, পানি ও মৎস্য আবাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের উপকূলীয় এলাকায় ৪,০০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার টাটা মুন্দ্রা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কথা উল্লেখ করা যায় (২০১৩ সালে উৎপাদন শুরু করে)। **ঐ কেন্দ্র হতে নির্গত গরম পানি এবং ছাই**

আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ায় মাছের যোগান কমে গিয়ে ঐ অঞ্চলের মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।[৩৭]

কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ

বায়ু দূষণ

একটি ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে উৎপাদিত বায়ু দূষণকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হল:

- **৭৯ লক্ষ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড যা প্রায় ৩৪ কোটি গাছ কেটে ফেলার সমান ।**
- ৫২ হাজার টন সালফার ডাই-অক্সাইড । এই সালফার ডাই-অক্সাইড এসিড বৃষ্টির কারণ এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে বাতাসে ক্ষুদ্র কণিকার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে ফুসফুস ও হার্টের রোগসহ বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ হয় ।
- ৩১ হাজার টন নাইট্রোজেন-অক্সাইড । এই নাইট্রোজেন-অক্সাইড ফুসফুসের টিস্যুর ক্ষতি করে, যার ফলে শ্বাসতন্ত্রের নানান রোগ হতে পারে ।
- ১৩০০ টন ক্ষুদ্র কণিকা, যার ফলে ব্রংকাইটিসসহ ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ বেড়ে যায় ।
- ১৯০০ টন বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড ।
- ৪৪০ পাউন্ড মারকারি বা পারদ । ২৫ একর আয়তনের একটা পুকুরে এক চা চামচের ৭০ ভাগের একভাগ পারদ পড়লে সেই পুকুরের মাছ বিষাক্ত হয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে । পারদের কারণে ব্রেন ড্যামেজসহ স্নায়ুতন্ত্রের নানান রোগ হয় ।
- ৫৯০ পাউন্ড বিষাক্ত আর্সেনিক যার ফলে আর্সেনিকোসিস এবং ক্যানসারের বিস্তার ঘটায় ।
- ৩০০ পাউন্ড সীসা, ১০ পাউন্ড ক্যাডমিয়াম এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য ভারি ধাতু ।

পানি দূষণ : কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কঠিন ও তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে, সংরক্ষণ আধার থেকে চুইয়ে বিভিন্নভাবে গ্রাউন্ড ও সারফেস ওয়াটারের সাথে মিশে পানি দূষণ ঘটায়, যার ফলে পানির মাছ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি হুমকির মুখে পড়ে ।

[৩৭] April 16, 2015, theguardian, https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/16/why-the-mundra-power-plant-has-given-tata-a-mega-headache

কঠিন ও তরল বর্জ্য : কয়লা পুড়িয়ে ছাই তৈরি হয় এবং কয়লা ধোয়ার পর পানির সাথে মিশে তৈরি হয় তরল কয়লা বর্জ্য (স্লারি) । ছাই এবং এই তরল কয়লা বর্জ্য – উভয়ই বিষাক্ত কারণ এতে বিষাক্ত আর্সেনিক, মারকারি বা পারদ, ক্রোমিয়াম এমনকি তেজষ্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থাকে । ছাই বা ফ্লাইঅ্যাশকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটে অ্যাশপন্ড বা ছাইয়ের পুকুরে গাদা করা হয় এবং তরল বর্জ্যকে উপযুক্ত ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দূষণমুক্ত করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু ছাই বাতাসে উড়ে গেলে, ছাই ধোয়া পানি চুঁইয়ে কিংবা তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটিতে বা নদীতে মিশলে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ ঘটে । একটি ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ এবং ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হয় যার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি বড় সমস্যা ।

শব্দ দূষণ : কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন, কম্প্রেসার, পাম্প, কুলিং টাওয়ার, কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি, পরিবহনের যানবাহনের মাধ্যমে ব্যাপক শব্দ দূষণ ঘটে থাকে ।

এটি প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, পানিসম্পদ ও জনবসতি বিবেচনায় বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নীতিমালা মোটেই দেশের কয়লা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের পথ নয় । আমরা তাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে একমত যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যতদিন উপযুক্ত নতুন প্রযুক্তি না আসবে ততদিন এই কয়লা রেখে দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে ।[৩৮] কেননা কৃষিজমি, পানি ও স্থানীয় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কতিপয় গোষ্ঠীর হাতে বাংলাদেশের কয়লাসম্পদ তুলে দেয়া যায় না । তাছাড়া **সকল তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে আর্থিক, কারিগরি ও পরিবেশগত – কোনো দিক থেকেই কয়লার ব্যবহার এখন আর অনুকূল নয় ।** যদি বিকল্প পথে কম ব্যয়ে, কম ঝুঁকিতে ও কম দূষণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে সেই পথ গ্রহণ করাই দায়িত্বশীল হবে ।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ

বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে গত কয়েক বছরে সরকারের নানাবিধ জোরালো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে । সরকারের তরফে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা, জীবাশ্ম জ্বালানির সংকট, নিম্ন বা শূন্য মাত্রার কার্বণ নিঃসরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ইত্যাদিকে এই তৎপরতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে । ফলশ্রুতিতে পাবনার অদূরে রূপপুরে ১২০০

[৩৮] February 6, 2014, bdnews24, http://bdnews24.com/bangladesh/2014/02/06/wait-for-new-technology-pm

মেগাওয়াটের দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট স্থাপনের কর্মতৎপরতা অব্যাহত আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞরাও ২০১৩ সাল থেকেই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের নিজস্ব দক্ষ জনশক্তি না থাকা, নিজেদের গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান না থাকা এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কিত বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা না থাকাকে সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁরা বাংলাদেশ সরকারকে এই প্রকল্প থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরে দায়মুক্তি বিল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনা, আর্থিক ক্ষতির কথা প্রকাশ করেও অনেকেই আশঙ্কা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এমনকি মূল নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার আগেই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের কথাও পত্রিকায় এসেছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের আগে তার স্থান, নির্মিতব্য প্ল্যান্ট ও প্রযুক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে Environmental Impact Assessment (EIA) রিপোর্ট করা, তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে সেই EIA রিপোর্ট যাচাই-বাছাই করা এবং এসব রিপোর্ট জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ক্ষেত্রে পরিবেশ সমীক্ষা আদৌ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত নয়। কারন এরকম কোন সমীক্ষা বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়নি, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পত্রিকায়ও এ সংক্রান্ত কোন খবর আসেনি।

পানি ব্যবস্থাপনা

রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা অর্থাৎ শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় কত পরিমাণ পানি লাগবে, শুষ্ক মৌসুমে নদীর সর্বনিম্ন পানির সরবরাহ কত থাকবে, পানির সরবরাহ নিশ্চিত রাখার জন্য ভারতের সাথে সুনিদির্ষ্ট কোন চুক্তি হবে কিনা, দূর্ঘটনাজনিত কারনে কি পরিমাণ অতিরিক্ত পানি লাগবে, তার সরবরাহ হবে কি করে ইত্যাদি খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এসবের কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। **স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখিয়েছেন রূপপুরে ৪৫৫ হাজার জিপিএম পানির প্রয়োজন হবে। আর গত ১২ বছরে পদ্মার পানির প্রবাহের গড় হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ১৫৫ হাজার জিপিএম পানি নদী থেকে নেয়া যাবে।**[৩৯] **আবার ২০১১ সালে পানির প্রবাহ প্রায় ৭৮ ভাগ কমে গিয়েছিল।** এ অবস্থায় পানির

[৩৯] June 5, 2915, thethirdpole, https://www.thethirdpole.net/2015/06/05/water-shortages-pose-risks-to-bangladeshs-first-nuclear-plant/

সমস্যা মারাত্মক আকার ধারন করতে পারে। আবার প্রতি বছরই তাপমাত্রার তারতম্য বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ইউরোপ, আমেরিকার গড় মানের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে কুলিং টাওয়ার ইউরোপ, আমেরিকার প্যারামিটারে হিসেব করে নির্ধারণ করাও যৌক্তিক হবে না। পানি সংকটের প্রশ্নে সরকারি ভাষ্য হচ্ছেঃ রূপপুরের কেন্দ্রটিতে পানির প্রয়োজন মেটাতে কুলিং টাওয়ার এবং ক্লোজড ওয়াটার লুপ ব্যবহার করা হবে। তবে কি ধরণের কুলিং টাওয়ার ব্যবহার করা হবে, কুলিং টাওয়ারের পানি কি প্রক্রিয়ায় শোধন হবে, কুলিং টাওয়ারের ফিড ওয়াটারে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকবে, কি প্রক্রিয়ায় এর নিয়ন্ত্রণ হবে, পানির মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে কিনা, এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, রাশিয়া স্পেন্ট ফুয়েল নিলেও নিম্ন বা মধ্যম মানের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য রূপপুরেই সংরক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, স্পেন্ট ফুয়েল ফেরত নেওয়ার অর্থ হলো তা ফেরত নিয়ে পরিশোধন করার পর যে 'পুনরায় ব্যবহারযোগ্য' জ্বালানি ও অবশিষ্ট অতিমাত্রার তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক বর্জ্য পাওয়া যাবে সেটি আবার বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেওয়া। এ কাজটি করা হবে চুক্তিবদ্ধ অর্থের বিনিময়ে। অন্যদিকে পারমাণবিক বর্জ্য ফেরত নেওয়ার অর্থ হচ্ছে স্পেন্ট ফুয়েল পরিশোধন করে তা থেকে পাওয়া ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি ফেরত দিয়ে অবশিষ্ট বর্জ্য রেখে দেয়া। রাশিয়ার বিদ্যমান আইন আনুযায়ী সেটি সম্ভব নয়।[৪০]

পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আবদুল মতিনের মতে, 'তেজস্ক্রিয় জ্বালানির বর্জ্য অত্যন্ত সুরক্ষিত ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়। এ জন্য এমন একটি বিচ্ছিন্ন স্থান প্রয়োজন হয়, যেখানে কোনোভাবেই পানি প্রবেশ করতে পারবেনা। সাধারণত মাটির অনেক নিচে জলাধার তৈরি করে সেখানে শক্তিশালী কংক্রিট দিয়ে ঘিরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণ করা হয়। যদিও একসময় এই জ্বালানি পুনরায় ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আলাদা একটি বিশেষায়িত স্থাপনা নির্মাণ ও সংরক্ষণ করার মতো। এতে যেমন ব্যয় আছে, তেমনি আছে ঝুঁকি।'[৪১] তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে

[৪০] November 27, 2016, Prothom Alo, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1028867/

[৪১] October 27, 2016, Prothom Alo, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1008605/

স্পষ্ট অবস্থান ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর অদূরদর্শিতার পরিচয়ই বহন করে ।

অর্থনৈতিক দিক

'সবচেয়ে আধুনিক', 'সবচেয়ে সস্তা', 'অনিঃশেষ শক্তির উৎস', 'নিরাপদ' ইত্যাদি নানান বিজ্ঞাপনের মোড়কে পারমাণবিক বিদ্যুতের প্রচারণা শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই । কিন্তু সেই সস্তা বিদ্যুতের কাল আর আসেনি । বরং সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ উৎপাদনী উৎস হিসেবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ এখন শীর্ষে ।

২০০৯ সালে রূপপুর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১ লক্ষ কোটি টাকা (১২.৬৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার) । বর্তমানে ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা হয়েছে । আবার রূপপুর কেন্দ্রটিতে ভারী যন্ত্রপাতি সরবরাহের লক্ষে নৌপথ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ড্রেজিংয়ের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে প্রায় ৯৫৬ কোটি টাকা (সূত্রঃ ইত্তেফাক, ১ আগস্ট, ২০১৭) । 'ফিক্সড কস্ট' মডেলের পরিবর্তে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণ চুক্তি হয়েছে 'কস্ট প্লাস' মডেলে । এর ফলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খরচের অংক দফায় দফায় বাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে ।

প্রারম্ভিক ব্যয়ের ফাঁক-ফোকর এবং নানা পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির উদাহরণ

পারমাণবিক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকল্পের সময়কাল বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্প-ব্যয় বৃদ্ধির অনেক নজির রয়েছে । যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ৭৫টি চুল্লীর নির্মাণ কাজ শুরু হয় । পরবর্তীতে প্রতিটি পারমাণবিক চুল্লির খরচ প্রারম্ভিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে গড়ে ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় । ২০০৭ সালে ফ্রান্সের ফ্লামেনভিলে ১৫৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয় । প্রকল্পের শুরুতে এই কেন্দ্রটির ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩.৩ বিলিয়ন ইউরো । ২০১২ সালের মধ্যেই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল । অথচ, নানা ধাপে খরচ বাড়িয়ে বর্তমানে এই প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ১০.৫ বিলিয়ন ডলারে । ২০১৮ সালের আগে নির্মাণ কাজ শেষ হবে না বলেও জানানো হয়েছে ।

১৯৯৫ সালে ৮টি পারমাণবিক চুল্লী পরিচালনা আর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে 'ব্রিটিশ এনার্জী' নিবন্ধন লাভ করে । পরের বছরই এটিকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয় । মাত্র ৭ বছরের মাথায় এই কোম্পানি চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চায় । ২০০৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানিটিকে ৩ বিলিয়ন পাউন্ডের (২০১৭ এর দাম স্তর

অনুসারে প্রায় ৯ বিলিয়ন পাউন্ড বা প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা) 'বেইল আউট' সুবিধা প্রদান করে এবং এর সমস্ত দেনা পরিশোধের দায়িত্ব নেয় (সূত্রঃ দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪)। অপরদিকে যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বর্জ্য পরিশোধন ও নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রদান করার আয়োজন চলে 'সেলাফিল্ড নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সে'। এই কেন্দ্রটি চালাতে বছরে ৩ বিলিয়ন পাউন্ড বা ৩৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। বর্তমানে এখানে চালু থাকা ৯ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার ১৫টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নিজ নিজ আয়ু শেষে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করতে কমপক্ষে ৭৩ বিলিয়ন পাউন্ড বা সাড়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (http://www.i-sis.org.uk)। এই সকল খরচের ভার কোন কোম্পানি কিংবা ইন্সুরেন্স পলিসি বহন করে না। **এই সকল রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি যদি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের সাথে যুক্ত করা হয় তবে এই বিদ্যুতের মূল্য নিশ্চিতভাবেই বেড়ে যাবে কয়েক গুণ**। এক্ষেত্রে তাই চলতে থাকে নানান ধরণের আইনের মারপ্যাঁচ। যেমন, ভারতে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য আইন (রাইট টু ইনফরমেশন) থাকলেও পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করা হচ্ছে তা এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে।

রূপপুর প্রকল্পের জন্য রাশিয়ার ঋণ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে প্রাক্কলিত ১২.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ১১.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাশিয়া ঋণ দেবে, বাকি অর্থ দেবে বাংলাদেশ সরকার। ঋণ পরিশোধ করার সময়কাল ২০ বছর এবং ঋণের সুদ দিতে হবে ১.৭৫% + LIBOR রেট (লন্ডন ইন্টারব্যাংক অফারড রেট)। সর্বোচ্চ সুদের হার ৪%। এক হিসেবে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন নির্মাণ খরচ, জ্বালানির খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি খরচ যোগ করলে, হিডেন কষ্ট বা অদৃশ্য খরচ হিসাবে না ধরেই, প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে ৭.৫০ থেকে ৮ টাকা। অন্যদিকে, সৌর এবং বায়ু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে সব ধরনের ভর্তুকি খরচ ছাড়াই প্রতি ইউনিটে দাম কমেছে যথাক্রমে ৮২% এবং ৬১% (অন্যান্য তথ্যসূত্রে দেখুন LAZARD LCOE Analysis, 2015)। ভারতে প্রতি ইউনিট সৌর এবং বায়ু বিদ্যুৎ এখন সাড়ে তিন টাকারও কম মূল্যে উৎপাদিত হচ্ছে (http://www.mnre.gov.in/)।

দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং দায়মুক্তি আইন

ষাটের দশকে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রিঅ্যাক্টরের চারপাশে নিরাপত্তা ব্যূহ (containment building) ছাড়াই ৪০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করার প্রস্তাব দিয়েছিল রাশিয়া। নিরাপত্তা ব্যূহের অনুপস্থিতির কারণ জানতে

চাইলে বলা হয়েছিল, রিঅ্যাক্টর ডিজাইনে কোন খুঁত নেই, তাই চারপাশে ব্যুহ তৈরীর প্রয়োজন নেই! অথচ ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলে রাশিয়ার নিজস্ব পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেই একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য নিরাপত্তা ব্যুহ না থাকায় তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়িয়ে পড়ে তাৎক্ষণিক ভাবে (অন্যান্য তথ্যসূত্রে দেখুন Matin, ২০১০)।

প্রচার করা হচ্ছে, যেকোনো ধরণের ঝুঁকি মোকাবেলায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে ব্যবহার করা হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। অথচ আমরা দেখেছি দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তিও জাপানের ফুকুশিমা দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ঠেকাতে পারেনি। ফুকুশিমা দুর্ঘটনার দুই বছর পরও ওই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। জাপান সরকার ইতোমধ্যেই ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লীকে সম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব মুক্ত করতে ১৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছে।[৪২]

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা থেকে স্থানীয়দের সরাতে পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে।[৪৩] অথচ এতো বিপুল জনগোষ্ঠীকে দ্রুত সরানোর পরিকল্পনা অনুপস্থিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাস বা পানির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পরতে পারে। ছড়িয়ে পরা তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারণ, তার পরিমাপক,বা নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্য স্বাধীন রেগুলটরি কমিটি থাকতে পারে। আবার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যকারিতা যাচাই-বাছাই, নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনঃপরীক্ষা করার জন্য একটি তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি আবশ্যক।[৪৪] একাজে বর্তমানে রাশিয়ার অপর একটি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা যায়। তৃতীয় পক্ষ হিসাবে খোদ রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ। উল্লেখ্য, রাশিয়ার কোম্পানি রোসাটমের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের করা চুক্তিতে একটি দায়মুক্তি সম্পর্কিত বিধান যুক্ত করা হয়েছে। পত্রিকায় এ বিষয়ে খবর এসেছে এভাবে '**...রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার যেকোনো পর্যায়ে, যেকোনো কারণে পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী হিসেবে বাংলাদেশকে নিতে হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সরবরাহকারী রাষ্ট্র রাশিয়া দুর্ঘটনার কোনো দায় নেবে না।** এই

[৪২] December 9, 2016, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-tepco-fukushima-costs/japan- nearly-doubles-fukushima-disaster-related- cost- to-188-billion-idUSKBN13Y047

[৪৩] June 5, 2015, thethirdpole, https://www.thethirdpole.net/2015/06/05/water-shortages-pose-risks-to-bangladeshs-first-nuclear-plant/

[৪৪] July 24, 2016, Dhaka Tribune, http://archive.dhakatribune.com/bangladesh/2016/jul/24/we-have-no-expertise-run-nuclear-plant

বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণে কোনো বিপর্যয় ঘটলে কিংবা কেন্দ্রটির জন্য সরবরাহ করা পারমাণবিক জ্বালানি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার পর তা থেকে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দায়দায়িত্ব বাংলাদেশকেই নিতে হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে যে সাধারণ চুক্তি (জেনারেল কন্ট্রাক্ট) সই হয়েছে, তার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে পারমাণবিক দুর্ঘটনার দায়দায়িত্ব নিরূপণের (নিউক্লিয়ার লায়াবিলিটি) বিষয়ে এই বিধান যুক্ত করা হয়েছে...'। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ভবিষ্যতের যে কোন দুর্ঘটনা কিংবা আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নীতি প্রণয়ন, নির্মাণ এবং পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়মুক্তি দিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন ২০১৫ ইতোমধ্যেই পাশ করা হয়েছে।

কয়লা, এলএনজি এবং পারমাণবিক বিদ্যুতের অপ্রকাশিত খরচ

কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিষয়ক আলোচনার একটি বড় দিক হলো এর ব্যয়ববহুল অবকাঠামো এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থার দূষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুমুখী খরচ। কিন্তু উল্লেখ্য, এই কয়লা এবং পারমাণবিক বিদ্যুতে উৎপাদনের বহুমুখী খরচের বিষয়টিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে দুটি বহুল প্রচারিত বিতর্ক হচ্ছে:

১. সৌর ও বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল

২. ব্যাপক হারে সৌর ও বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রয়োজন।

বলাই বাহুল্য **কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তাকে আড়াল করে রাখতেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির খরচ বিষয়ে অমূলক প্রচারণা চালানো হয়।**

নিচের ছকে কয়লা, এলএনজি এবং পারমাণবিক বিদ্যুতের বিভিন্ন অপ্রকাশিত খরচের (হিডেন কস্ট) বিবরণ দেয়া হলো।

ছক: সরকার পরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের অপ্রকাশ্য খরচ (হিডেন কস্ট)

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	প্রতি হাজার মেগাওয়াট স্থাপন খরচ	জ্বালানি মূল্য ব্যতীত অন্যান্য খরচের খাত (বিদ্যুৎ ট্যারিফের অন্তর্ভুক্ত নয়)	টাকার অংকে প্রকাশিত কিছু হিডেন কস্ট

এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা	এলএনজি টার্মিনাল এবং রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট খরচ: *মহেশখালির জন্য প্রাক্কলিত ১,৪৩৬ কোটি টাকা।[৪৫] *মহেশখালী ২য় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয় ৪ হাজার কোটি টাকা।[৪৬] *কুতুবদিয়া এলএনজি টার্মিনাল সংশ্লিষ্ট ব্যয় ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।[৪৭]	*ভারতে প্রতি ইউনিট কয়লা বিদ্যুৎ বায়ু দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির ব্যয় টাকার অংকে ৬ থেকে ২৫ টাকা।[৪৮] *চীনে ২০০৭ সালে কয়লা ব্যবহার জনিত দূষণ, অসুস্থতা, প্রাণহানি ও অন্যান্য ক্ষতির আর্থিক মূল্য ছিল বাংলাদেশী টাকায় ২০ লক্ষ কোটি টাকা। এই ক্ষতির অংক উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য বেড়ে যেত কমপক্ষে ২৫%।[৪৯]
			*কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দূষণ থেকে বাঁচতে চীন সরকার ২০১৩ সাল থেকে পরবর্তী ৫ বছরে ২৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২২ লক্ষ কোটি টাকা) খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৫০]

[৪৫] July 12, 2017, Dhaka Tribune, http://www.dhakatribune.com/bangladesh/power-energy/2017/07/12/ifc-finance-maheshkhali-lng- terminal/

[৪৬] April 21, 2017, https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/dhaka/bangladesh-inks-final-deals-to-build-2nd-floating -27818358

[৪৭] April 10, 2017, http://www.lngworldnews.com/petronet-petrobangla-sign-bangladesh-lng-terminal-deal/

[48] Westfal M., Godinot S., Doukas A. 'Hidden Cost,' Oil Change International, 2015

[৪৯] October 27, 2008, https://www.reuters.com/article/us-china-coal-cost-idUSTRE49Q4FI20081027

[৫০] August 19, 2013, Mongabay, https://news.mongabay.com/2013/08/china-pledges-275-billion-over-5-years-to-cut-record-air-pollution

			*ষাটের দশক থেকে ব্যবহার শুরু করে যুক্তরাজ্যে এখন প্রায় ৯ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার ১৫টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন রিঅ্যাক্টর চালু আছে।[৫১] কিন্তু বরাবরই এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কম দেখানোর চেষ্টা চলে আসছে। নিবন্ধনের মাত্র ৭ বছরের মাথায় ৮টি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর পরিচালনা ও উৎপাদনকারী কোম্পানি 'বিট্রিশ এনার্জি' আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানিটিকে ৩ বিলিয়ন পাউন্ডের 'বেইল আউট' সুবিধা প্রদান করে এবং এর সমস্ত দেনা পরিশোধের দায়িত্ব নেয়।
কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা	* জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন করতে নৌপথ ড্রেজিং [৫৪] * কয়লা আমদানী উপযোগী বন্দর প্রস্তুতকরণ[৫৫] * দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব মওকুফ সুবিধা প্রদান[৫৬,৫৭] *কয়লা আনয়নের জন্য রেলপথ নির্মাণ[৫৮]	

[৫১] October 21, 2013, theguardian https://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/nuclear-power-in-the-uk-a-history

[৫৪] ১৭ জুলাই ২০১৭, বণিকবার্তা। 'রামপালে কয়লা পরিবহন: নৌপথ সচল রাখতে বাংলাদেশ ভারত চুক্তি'

[55]March 10, 2017. http://www.thefinancialexpress- bd.com/ 2017/03/ 10/ 63984/Development-of-ports-and-transportation-for-trade-facilitation/print

[৫৬]http://print.thefinancialexpress-bd.com/old/index.php?ref=MjBfMDNfMTRfMTNfMV8xXzE2MzEzOQ==

[৫৭] http://archive.dhakatribune.com/bangladesh/2016/jun/14/indian- supplier- rampal-plant-get-tax-exemption

[৫৮] December 20, 2016. http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/ view/dhaka-payra-railway-to-be-developed-by-uk-company.html

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রায় ৪৭ হাজার কোটি টাকা	* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সাথে 'ফিক্সড কস্ট' মডেলে নয়, বরং 'কস্ট প্লাস' মডেলে চুক্তি হয়েছে। **এর ফলে সময়ে সময়ে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান খরচের অংক বাড়িয়ে নিতে পারবে, এমনকি ঐ প্রতিষ্ঠানের লাভের হিস্যাও এর মাধ্যমে বাড়ানো যাবে।**[৫৯] * রূপপুরে ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনে নদী ড্রেজিংয়ে ৯৫৬ কোটি টাকার প্রকল্প।[৬০] * তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পরিবহন, ঝুকিমুক্ত-করণ এবং নিরাপদ সংরক্ষণ খরচ।	*যুক্তরাজ্যের পারমাবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বর্জ্য পরিশোধন ও নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রদান করা হয় যে সেলাফিল্ড নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স সেটি চালাতে বছরে ৩ বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয় *ব্রিটেনে চালু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর সেগুলোকে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করতে কমপক্ষে ৭৩ বিলিয়ন পাউন্ড খরচ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে যার পুরোটাই রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভর্তুকি দেয়া হবে। এসব রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি বিবেচনায় নিলে এই বিদ্যুতের মূল্য বেড়ে যাবে কয়েক গুণ।[৫২] * ২০০৭ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া ফ্রান্সের ফ্লেমেনভিলেতে ১,৫৭০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ২০১২ সালের মধ্যে শেষ করার প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রারম্ভিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩.৩ বিলিয়ন ইউরো। নানা ধাপে খরচ বাড়িয়ে এখন বলা হচ্ছে এটি নির্মাণে ১০.৫ বিলিয়ন খরচ হবে আর নির্মাণ কাজ শেষ হবে ২০১৮ সালে।[৫৩]
সৌর	প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা		

[৫২] Science in Society Archieve, http://www.i-sis.org.uk/NuclearFinancialand-SafetyNightmare.php

[৫৩] https://www.ft.com/content/73d62552-ec65-11e5-bb79-2303682345c8

[৫৯] December 31, 2015. http://www.thedailystar.net/op-ed/politics/rup-pur-nuclear-power-plant-bangladeshs-potential-blackhole-194017

[60] August 1, 2017. http://www.ittefaq.com.bd/national/2017/08/01/122407

বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি: সম্ভাবনা ও প্রশ্নসমূহ

সরকারি মহাপরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিপুল সম্ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়নি। ধারণা করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে, বিশেষত কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ লবির প্রভাবে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিশাল সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সেজন্য ২০৪১ সালেও বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৩,৬৬৬ মেগাওয়াট, যা ওই সময়ে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষমাত্রার শতকরা মাত্র ৬.৫ ভাগ (পিএসএমপি পৃ. ১-৬১)। আমরা মনে করি বর্তমান প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, এবং আর্থিক-সামাজিক-পরিবেশগত সব বিষয় আমলে নিলে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমেই সরকারি প্রস্তাবের বহু গুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রচলিত অভিযোগ বা সমস্যা বিবেচনা করেই আমরা এই বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবনা রাখবো।

প্রযুক্তিগত বিবেচনা

বাংলাদেশের প্রতি বর্গমিটার এলাকায় প্রতিদিন ৩ হাজার থেকে ৫.৫ হাজার ওয়াট সৌর রশ্মি আসে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত সৌররশ্মি জার্মানির তুলনায় বেশি। বর্তমানে যে মনোক্রিস্টালাইন ও পলিক্রিস্টালাইন সৌর প্যানেল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা সর্বোচ্চ যথাক্রমে শতকরা ২২ ও ১৬ ভাগ।

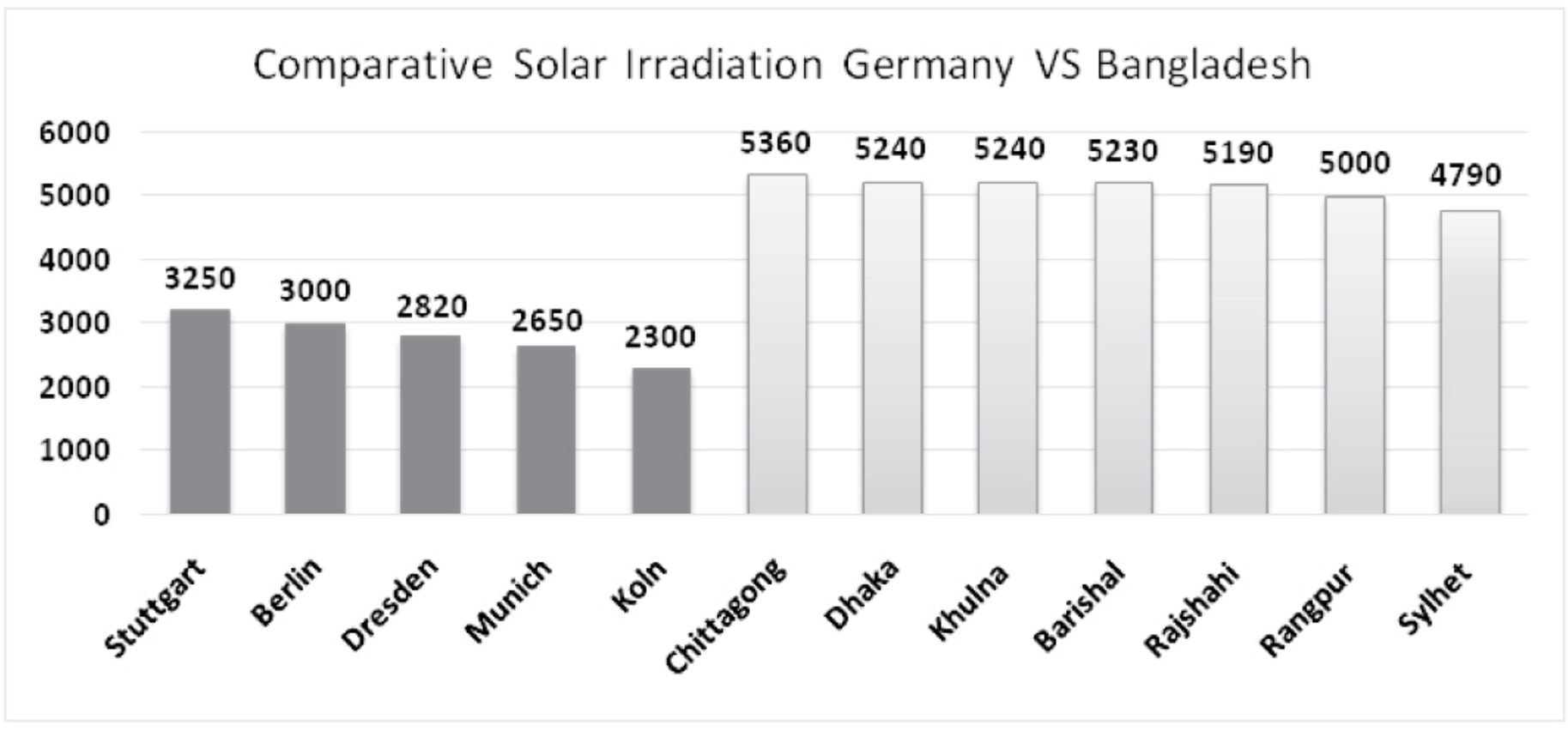

Source: Strzalka, Aneta; Siddiquee, Zahid Hasan & Eicker, Ursula. "Potential of Roof Top PV- System for Supplying Electricity in Residential Area." ICDRET'09, December 17-19, 2009, Dhaka, Bangladesh,
(NREL) National Renewable Energy Laboratory. "Solar Irradia-

tion of Bangladesh". http://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php"

জমি বিতর্ক/স্থান বিতর্ক

বাংলাদেশ ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশে জমির অভাব, মাথাপিছু জমির প্রাপ্যতা খুবই কম। কৃষি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন হওয়ায় কৃষিজমি ক্ষতি করে কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়। সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই সমস্যার কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলেও সরকারি নানা প্রকল্প নিয়মিতভাবে কৃষিজমি গ্রাস করছে। প্রকৃতপক্ষে সৌরবিদ্যুৎ সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণা এখন আর ঠিক নয়। **যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সৌরবিদ্যুৎ কৃষি জমিকে নষ্ট করবেনা** বরং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের গবেষণা থেকে দেখা যায় সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২ একরের চাইতেও কম জমি প্রয়োজন। **ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ট্রান্সপোর্ট এন্ড ডিজিটাল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার (বার্লিন) এর সাম্প্রতিক (২০১৫) একটি গবেষণায় প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১.৭ একর জমির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে**। এছাড়া বিভিন্ন দেশে বৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বোচ্চ ৪ একর জমির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ভারতের তামিলনাড়ুতে আদানির ৬৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য স্থান প্রয়োজন হচ্ছে ২,৫০০ একর বা মেগাওয়াট প্রতি ৩.৮৬ একর।[৬১]

আমাদের সমীক্ষা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, **সরকারের হাতে এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দখলে যে বিপুল পরিমাণ জমি আছে তা ব্যবহার করলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় অংশ বাস্তবায়ন সম্ভব**। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশে বৃহৎ পরিসরের কেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের চাইতে বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় (আলাদা ভাবে বিভিন্ন এলাকায়) অনেক কম জায়গা ও কম বিনিয়োগে সৌর বিদ্যুতের প্রসার সম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় বিপুল পরিমান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, যেখানে গ্রাহক তার চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করতে পারে। নগর এলাকার সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজ, অফিস, আদালত, হাসপাতাল, বাণিজ্যিক ভবন, পরিত্যক্ত জমি ও জলাভূমি ইত্যাদি যুক্ত করা হলে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় শতকরা এক ভাগ

[৬১]The Hindu. Adani's 648-MW solar plant inaugurated. September 22, 2016. Retrieved from http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/Adani%E2%80%99s-648-MW-solar-plant-inaugurated/article14993341.ece)

জায়গা সহজেই জোগাড় করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কৃষি জমি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন হবে না।

ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি ইকোনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিয়াল এনালাইসিস (আইইইএফএ) এর মতে, শতকরা ২ ভাগ জায়গা ব্যবহার করে বাংলাদেশ ২ লক্ষ ৪০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৩৮০ টেরাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।[৬২] উল্লেখ্য ২০৪১ সাল বাংলাদেশে মোট বিদ্যুতের চাহিদা হবে ২৩৮ টেরাওয়াট-আওয়ার, এর মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ থেকে ১০৫ টেরাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। এর পুরোটা জমিতে করলেও এর জন্য জমির প্রয়োজন হবে শতকরা ০.৫৫ ভাগ। এছাড়াও বর্তমানে সোলার শেয়ারিং প্রযুক্তি বিকাশের ফলে কৃষিজমিতেও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ব্যাটারি বিতর্ক

বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পুরোনো প্রযুক্তির ফ্লাডেড লেড এসিড ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব ব্যাটারি খুব দ্রুত (এক বছরের মাথায়) কার্যকারিতা হারায়। পাশাপাশি এতে সর্বোচ্চ ১৫০০ থেকে ২৪০০ ওয়াট ঘন্টার বেশি শক্তি সঞ্চয় করা যায় না। এতে পরিবেশ দূষণও বেশি। দামও বেশি। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে লিথিয়াম আয়ন এবং মেটাল অক্সাইড প্রযুক্তির ব্যাটারির মাধ্যমে ১০ থেকে ১৫ গুণ বেশি শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছে। দূষণ ন্যূনতম, দামও কমছে।[৬৩]

ব্যাটারিসহ এনার্জি স্টোরেজ পরিকল্পনা

বিকল্প বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনার সৌর বিদ্যুৎ বাস্তবায়নের পরিমান ও পিএসএমপি ২০১৬ এর প্রাক্কলিত ডিমান্ড কার্ভ (পৃ. ১১-৪৯) পর্যবেক্ষণ করে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত (সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্দিষ্ট সময়) বিদ্যুৎ চাহিদা ও তার সাথে সম্পর্কিত এনার্জি স্টোরেজের পরিমাণ দেখানো হল (আলোচনার সুবিধার্থে পিএসএমপি ২০১৬-তে দেখানো ২০২০ এর ডিমান্ড কার্ভকে '২০২১', এবং ২০৩০কে ২০৩১ হিসেবে দেখানো হল)।

[৬২] (IEEFA) Institute of Energy Economics and Financial Analysis. "Bangladesh Electricity Transition: A Diverse, Secured, Deflationary Way Forward." November, 2016. P 22.

[৬৩] Greentechmedia. Stem CTO: Lithium-Ion Battery Prices Fell 70% in the Last 18 Months. June 28, 2016.https://www.greentechmedia.com /articles/read/stem-cto-weve-seen-battery-pric-es-fall-70-in-the-last-18-months. TESLA, Utility and Business Energy Storage. June 2017.available at https://www.tesla.com/powerpack

ছক: ব্যাটারিভিত্তিক এনার্জি স্টোরেজ পরিকল্পনা

সাল	বেলা ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চাহিদা (প্রায়)	জাতীয় কমিটি রূপরেখায় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন অনুপাত	চাহিদার চেয়ে বাড়তি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	শুধুমাত্র সৌরবিদ্যুতের জন্য এনার্জি স্টোরেজের প্রয়োজন	সুষ্ঠু গ্রীড ব্যবস্থাপনার জন্য এনার্জি স্টোরেজের পরিমাণ মেগাওয়াট আওয়ার
২০২১	২৫%	৫%	হা	নাই	২০০
২০২৫	২৬.৪%	১৩%	হা	নাই	৩০০
২০৩১	২৭%	২৭%	হা	নাই	৫০০
২০৩৫	২৭.৫%	৩৩%	৫.৫%	আছে	২৫ হাজার
২০৪১	৩০%	৪২%	১২%	আছে	৭৮ হাজার

দেখা যাচ্ছে জাতীয় কমিটির প্রস্তাব অনুসারে, ২০২১ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত সৌর বিদ্যুতের জন্য এনার্জি স্টোরেজের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রস্তাবিত এনার্জি মিক্সে যেহেতু বায়ু বিদ্যুৎও যুক্ত আছে সেহেতু ইন্টারমিটেন্সিসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি ম্যানেজমেন্টের জন্য ২০২১ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত খুব সামান্য পরিমাণে (৩০০-৫০০ মেগাওয়াট আওয়ার) এনার্জি স্টোরেজ'-এর প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু ২০৩১-এর পর থেকে উৎপাদিত বাড়তি সৌর বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের জন্য ব্যাটারিসহ এনার্জি স্টোরেজের অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে ২০৩১ সালের পরবর্তী সময়ে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ চাহিদার থেকে বেশি থাকবে। ২০৪১ পর্যন্ত বাড়তি উৎপাদনের এই ধারা বজায় থাকবে।

বেইজলোড বিতর্ক

বিতর্ক আছে যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বেইজলোড বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন অথবা বেইজলোড চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ব্যাটারি প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই

বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক।[৬৪] কেননা, প্রথমত: নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে যদি বিকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তবে বেইজলোড চাহিদা সামাল দেয়ার জন্যে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত ভাবে বিশাল আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নেই। দ্বিতীয়ত: উন্নত প্রযুক্তির ব্যাটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে বেইজলোড চাহিদার যোগান দেয়া সম্ভব।

বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুতের তিক্ত অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশে সোলার হোম সিস্টেম সংখ্যায় অনেক ছড়ালেও কার্যকরিতার দিক থেকে খুব সাফল্য দেখাতে পারেনি। এর কারণ অনুসন্ধান এখানে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ মোটা দাগে ৪টি মডেলে বাস্তবায়িত হয়েছে: ১. সোলার হোম সিস্টেম ২. সোলার ইরিগেশন ৩. সোলার মিনিগ্রীড ৪. সোলার রুফটপ।

সোলার হোম সিস্টেম: প্রথমত, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে সোলার হোম সিস্টেমের দাম এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করার একটি গাইডলাইন থাকলেও ইডকলের তালিকাভুক্ত কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই নীতি মেনে পণ্য সরবরাহ করেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, **নিম্নমানের ব্যাটারি, লাইট, প্যানেল ইত্যাদি দিয়ে সোলার হোম সিস্টেম ডিজাইন করায় বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হোম সিস্টেমে সমস্যা দেখা যায়**। দেখা গেছে গ্রাহক পর্যায় থেকে বহু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় পরবর্তী সেবা বা কাস্টমার সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে গাফিলতি করা হয়। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা বা দিকনির্দেশনা না থাকায় বাজার মূল্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন মূল্যে পণ্য বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।
রুফটপ: সরকারি বাধ্যবাধকতার কারণে বেশ কয়েক বছর আগে নগর এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে 'রুফটপ সোলার' স্থাপন করা শুরু হয়, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে গ্রাহকেরা ব্যাপক হয়রানির শিকার হয়। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যকলাপ চোখে পড়েনি।

মিনিগ্রীড: মিনিগ্রীড প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে গ্রামীণ চাহিদা নগর জীবনের

[৬৪] According to Tim Buckley, from the Institute of Energy Economics and Financial Analysis, the idea of "base load" generation as an essential part of the energy mix is becoming redundant, and turning into a myth dreamed up by the fossil fuel industry to protect its interests. According to Sven Teske, an Analyst with the Institute for Sustainable Futures in Sydney, "Base load is not a technical concept, it is an economic concept and a business concept of the coal industry that is no longer feasible." See Parkinson, Giles. "Base Load" Power: A myth used to defend the fossil fuel industry. Available at http://reneweconomy.com.au/base-load-power-a-myth-used-to-defend-the-fossil-fuel-industry-96007/

চাহিদার চেয়ে অনেক কম হওয়ায়, এবং গ্রামীণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরন আলাদা হওয়ায়, এই প্রকল্পগুলো এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়াও মিনিগ্রীড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনকারীকে গ্রীড এবং যাবতীয় আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত নির্মান ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করতে হয় বলে তার বিনিয়োগ খরচ শুরুতেই অত্যাধিক বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ বিনিয়োগ উঠিয়ে নেয়ার জন্যে কোম্পানিগুলো প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৩০ থেকে ৩২ টাকায় বিক্রি করে। গ্রাহক পর্যায়ে অতিরিক্তি দামের কারণে অনেকেই শেষ পর্যন্ত মিনিগ্রীড সিস্টেম থেকে সরে আসে। এখানে উল্লেখ্য ভারতের বিভিন্ন মিনিগ্রীড প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেই জমি ক্রয়, প্রস্তুতকরণ, গ্রিড নির্মান, এবং গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা দেয়া হয়। **অন্যদিকে বাংলাদেশে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে বিপুল ভর্তুকি ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হলেও সোলার রুফটপ, হোম সিস্টেম, বা মিনিগ্রীড প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে নীতিগত সহায়তা অপরিহার্য ছিল তা অনুপস্থিত।**

সোলার ইরিগেশনঃ সোলার ইরিগেশন সিস্টেম চালু হওয়ার পর গ্রিড ও ডিজেল পাম্পের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসায় বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। ইডকলের তথ্য অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৬০৭টি সোলার ইরিগেশন প্রজেক্ট সফল ভাবে চলছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে বলে যে অভিযোগটি রয়েছে তার প্রধান কারণঃ **১. নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারকির অভাব। ২. বিক্রয়মূল্যের নিয়ন্ত্রণে নীতিমালার অভাব এবং ৩. মিনিগ্রীড স্থাপনে রাষ্ট্রীয় সহায়তার অনুপুস্থিতি।**

বায়ু বিদ্যুৎ বিতর্ক ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করে। বিশেষ করে কুতুবদিয়ার এক মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পটির উদাহারণ টেনেই এই অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে কুতুবদিয়ার বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পটি ব্যর্থ হওয়ার পিছনে রয়েছে মূলত অব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক অদক্ষতা, নিরাপত্তা বেষ্টনির অভাবে বিভিন্ন দরকারি যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাওয়া, উইন্ড ফার্ম পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব, প্রয়োজনীয় রিভার্স ইলেক্ট্রিসিটি বিতরণে পিডিবির গাফিলতি এবং সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণে রাষ্ট্রের গাফিলতি।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাবনা সৌর বিদ্যুতের চেয়ে কম। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত গতির বাতাস সব জায়গায় নেই।

তারপরও বায়ু বিদ্যুতের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা আছে যা নিয়ে সরকারের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য উদ্যোগই নেই।

বাতাসের গতি/কাটিং স্পিড বিতর্ক

২০০০ সালের আগ পর্যন্ত বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিটার (কিছু ক্ষেত্রে ৭ মিটার) বাতাসের গতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ২০০২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় এক দশকের গবেষণার ফলস্বরূপ, বর্তমানে প্রচলিত উইন্ড টারবাইনগুলোর (বায়ু বিদ্যুৎ চক্র) কাট-ইন স্পিড ২-৩.২ মিটার/সেকেন্ডে নেমে এসেছে।[৬৫] আমাদের দেশে একটি বিতর্ক চালু আছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার মতো পর্যাপ্ত বাতাসের গতি এখানে অনুপস্থিত। বলাই বাহুল্য, পুরনো প্রযুক্তির উদাহরণ টেনেই এই বিতর্কটি করা হয়। বর্তমান প্রযুক্তির উইন্ড টারবাইন ব্যবহার করা হলে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার মতো বাতাস বাংলাদেশের বহু স্থানেই বিদ্যমান।

বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশে বাতাসের গতিবেগ বিভিন্ন অঞ্চলে ৮০ মিটার উচ্চতায় গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ৬ থেকে ১১ মিটার।[৬৬] নিচের চার্টে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০ ও ৮৫ মিটার উচ্চতায় বাতাসের গতিবেগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দেখা যাচ্ছে।

[৬৫] (For Cutting Speed 2) I. Bayati, M. Belloli , L. Bernini , R. Mikkelsen , A. Zasso. "On the aero-elastic design of the DTU 10MW wind turbine blade for the LIFES50+ wind tunnel scale model", Politecnico di Milano, Department of Mechanical Engineering, University of Milan; Fluid Mechanics, Department of Wind Energy, Technical University of Denmark. 2016. Retrieved from (http://iopscience.iop.org/1742-6596/753/2/022028)
(For Cutting Speed 3) Cian Desmond, Jimmy Murphy, Lindert Blonk and Wouter Haans. “Description of an 8 MW reference wind turbine” MaREI (Marine and Renewable Energy IRELAND); University College Cork, Ireland, and DNV-GL, Turbine Engineering, Netherlands.

[৬৬] Amercian Jounral of Engineering Research. Wind Energy Potential In Bangladesh. Vol 5, Issue 7. 2016. pp. 85-94.

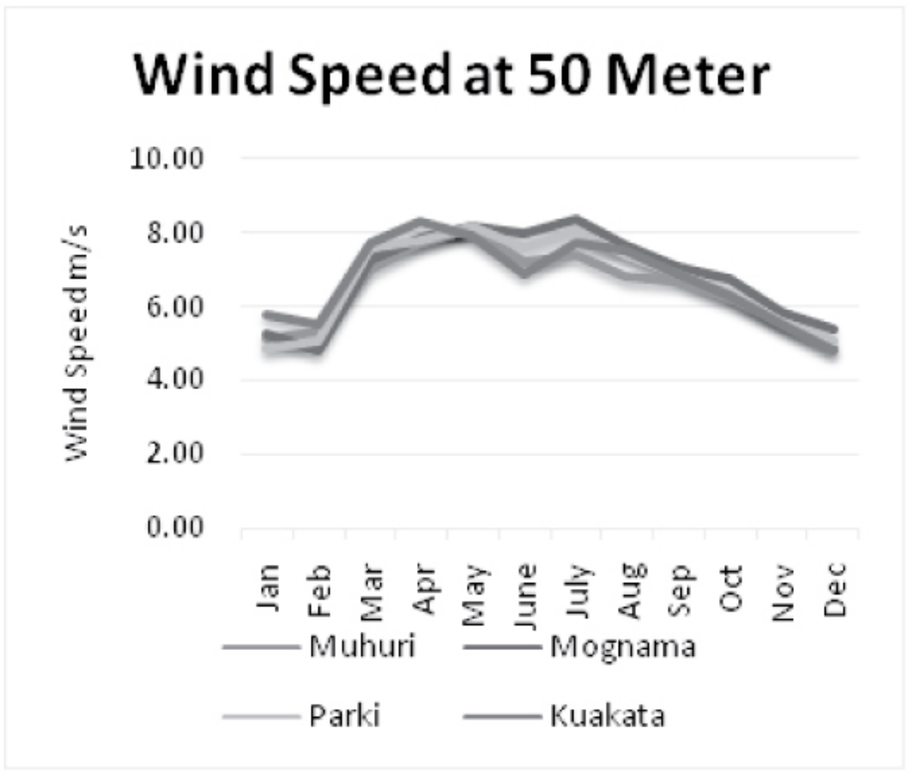

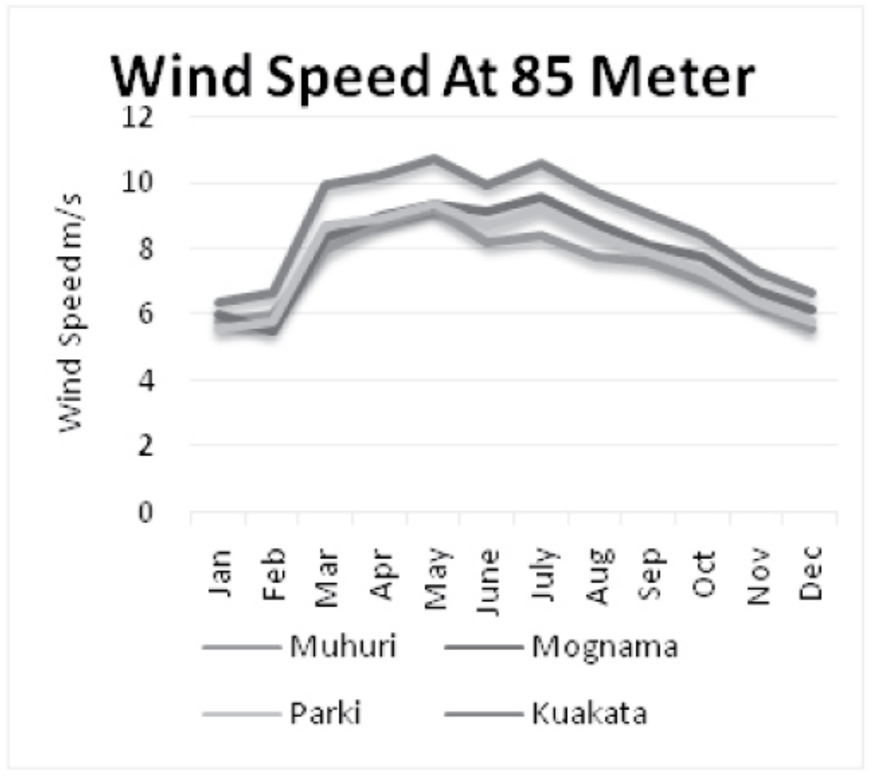

Source: (for Wind Speed at 50 Meter) Farha, Nazia, Safa Nur-Us, Rahamatullah, B.D., Ali, Sekendar. Prospects of Wind Energy in the Coastal Region of Bangladesh at 50 Meter. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 8, August-2012. (for Wind Speed at 85 Meter) Ongoing Research by National Energy and Power Research Council (EPRC), Bangladesh, 2016.

মনে রাখতে হবে যে, **গত ১০ বছরে বায়ু বিদ্যুৎ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। ফলে এখন বাতাসের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২.৫ মিটার থাকলেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।** এছাড়াও বায়ু বিদ্যুতের খরচও ক্রমাগত কমছে।[৬৭] ভারত সরকারের সর্বশেষ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ইতোমধ্যেই সেখানে ইউনিট প্রতি ৩ টাকা ২০ পয়সা হারে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।[৬৮]

বাংলাদেশের উইন্ড পকেট

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত গতির বাতাস সব জায়গায় না থাকলেও, কিছু কিছু স্থানে প্রয়োজনীয় গতির বাতাস সারা বছরই থাকে। বিশেষজ্ঞরা এরকম কিছু পর্যাপ্ত বাতাসের এলাকা (এয়ার/উইন্ড পকেট) চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হল: নাটোরের লালপুর, চাঁদপুরের জাফরাবাদ , কক্সবাজারের ইনানী বীচ, মগনামা ঘাট, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, পার্কি বীচ, রংপুরের বদরগঞ্জ, ময়মনসিংহের গৌরীপুর, হবিগঞ্জের মধুপুর চা বাগান, খুলনার দাকোপ, হাতিয়া, সেইন্টমার্টিন, কুতুবদিয়া, ফেনী জেলার মুহুরি বাঁধ, বিভিন্ন চর এলাকা এবং দক্ষিণাহঞ্চলের ৭০০ কিলোমিটার উপকূল রেখা।[৬৯]

[৬৭] International Renewable Energy Agency (Irena): The Power To Change:Solar And Wind Cost Reduction Potential To 2025, June 2016

[৬৮] http://www.mnre.gov.in/, accessed on 22 Nov. 2017.

[৬৯] (SREDA) Sustainable and Renewable Energy Development Authority Bangladesh. Wind Resource Mapping. Power Division. GOV. August 2016. Retreived from http://www.sreda.gov.bd/index-.php/site/page/2f45-680b-877b-3ec8-7bdc-f44a-721d-ac4b-1ff8-856c.

উল্লেখিত সবগুলো স্থানেই ৫০ মিটার উচ্চতায় গড়ে ৬ মিটার/সেকেন্ডে বাতাস প্রবাহিত হয়। বাতাসের এই গতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজীয় কাট-ইন স্পিড ২ মিটার/সেকেন্ডের অনেক বেশী। এইসব 'উইন্ড পকেট' গুলোতে সরকারের রিসোর্স ম্যাপিং-এর কাজ চলছে, যা ২০১৭ নাগাদ শেষ হবে। তবে বাণিজ্যিকভাবে বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাভজনক হতে হলে বাতাসের গতিবেগ ৬মিটার/সেকেন্ডের চেয়ে বেশী থাকা প্রয়োজন। এসব বিবেচনায় আমাদের বিশ্লেষণে দেখেছি, বাংলাদেশের ৭০০ কিলোমিটার উপকূল রেখা বরাবর ২-৩ স্তরে নির্দিষ্ট দূরত্বে ৮০ মিটার উচ্চতায় ছোট বড় টারবাইনের সমন্বয়ে বায়ু/উইন্ড পার্ক স্থাপন করা হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৪,৮০০ থেকে ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব (২৫% ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরে)।

বর্জ্য বিদ্যুৎ

বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ দুটোই উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য সুযোগ আছে। ২০১৫ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, সে সময় প্রতিদিন ৪৭ হাজার টন পৌর বর্জ্য এবং ৬ কোটি টন ডেয়রি/পোল্ট্রি বর্জ্য তৈরি হচ্ছিলো, যা থেকে ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব ছিল।[৭০] এছাড়াও বর্জ্য থেকে জৈবসার উৎপাদন করা সম্ভাব। আবার রাসায়নিক সার তৈরির জন্য বর্তমানে যে ৫৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তা তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারবে।

*নবায়নযোগ্য জ্বালনী ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নত্তোরের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট–২।

বিভিন্ন জ্বালানির তুলনামূলক খরচ

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য সন্নিবেশ করে দেখা যাচ্ছে যে, নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পুঁজি বিনিয়োগ খরচ গত ১০ বছরে কমেছে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় দেখা যায় প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম ৫ বছরে কমেছে ৫৮% (২০১০ থেকে)। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই দাম আরও ৫৯% কমবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৭১] **সরকারি পিএসএমপিতেও স্বীকার করা হয়েছে যে ২০৪০ পর্যন্ত সৌর বিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিটে কমবে ৫০%, বায়ু বিদ্যুতের দাম কমবে ৩০% এবং ব্যাটারির দাম কমবে ৪৫%।[৭২] অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম বাড়বে**

[৭০] Waste Concern. Municipal Solid Waste and Recovery Potential: Bangladesh Perspective. 2015.

[৭১] (IRENA) International Renewable Energy Agency. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. 2017. p. 10

[৭২] GOB. "The Study for Master Plan on Coal Power Development in the People Republic of

৪৫% । এরপরও কম দামের পথে না গিয়ে বেশি দামের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ বেছে নিয়েছে সরকার ।

এছাড়া অন্যান্য গবেষণাতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়াতে সৌর বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি কমে দাড়িয়েছে ৮ টাকা[৭৩] এবং বায়ু বিদ্যুতের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ।[৭৪]

নিচের ছকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দরপত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের একটি তুলনামূলক চিত্র হাজির করা হয়েছে (নিম্নতম দাম অনুযায়ী) ।

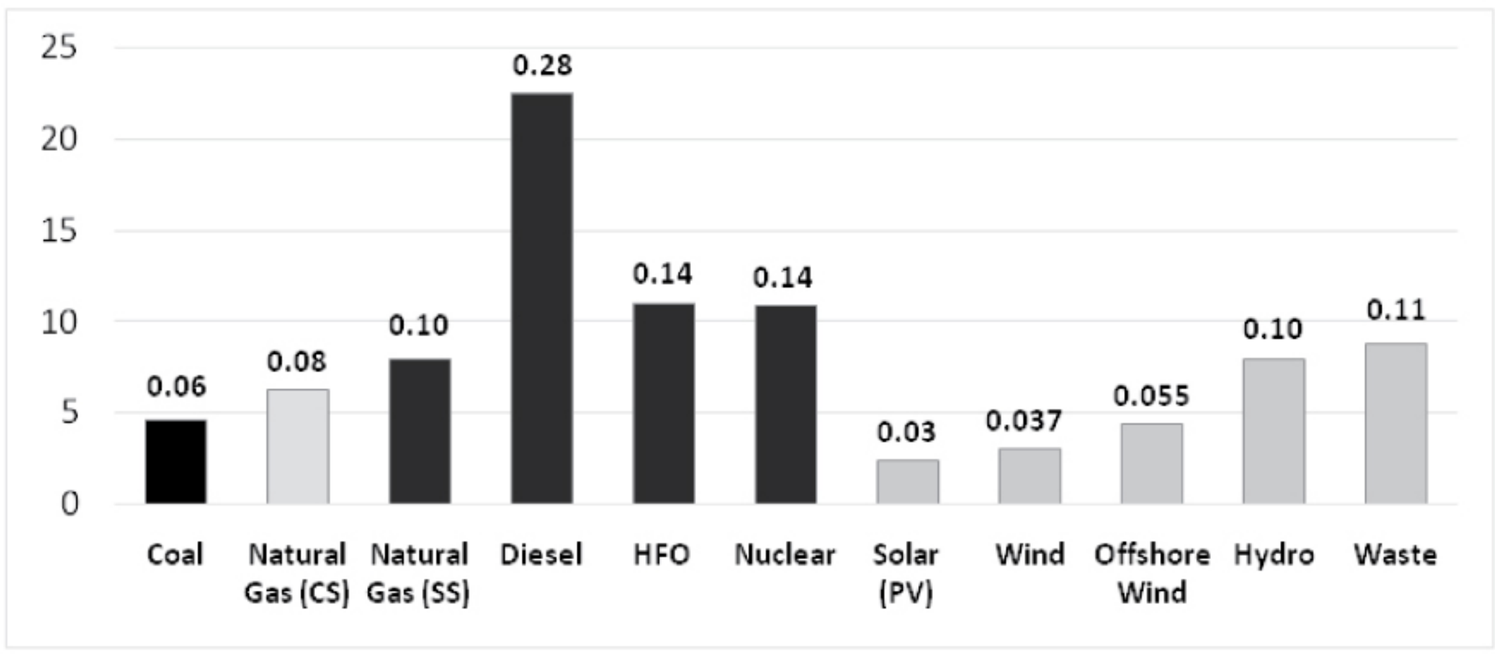

Electricity Generation Cost/KWh (USD)
Source: Energy Information Administration of USA (EIA) and International Renewable Energy Agency (IRENA).

ছক: বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যয়হ্রাসের তুলনামূলক চিত্র (২০১৪-২০১৫ দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করা হয়েছে; ১ ডলার=৮০ টাকা ধরে)

প্রযুক্তি/বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যম	খরচ (সাম্প্রতিক সময়ে অনুমোদনকৃত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি অনুসারে)[৭৫]	দামের ক্রম অবনোমনের খতিয়ান	প্রাক্কলিত দাম
সৌর বিদ্যুৎ	*২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের তথ্য অনুসারে ভারতে প্রতি ইউনিট মূল্য ৪ টাকা ৮০ পয়সা	* প্রতি ইউনিট সৌর বিদ্যুতের দাম ২০১০ থেকে ৫ বছরে কমেছে ৫৮% ।[৭৬]	*প্রতি ওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল মূল্য ২০৩০ সাল নাগাদ হতে পারে ৪৮ টাকা ।[৭৯]

[৭৩] (IRENA) International Renewable Energy Agency. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. 2017. p 36
[৭৪] ibid, p. 59.
[৭৫] Frankfurt School-UNEP Centre/Bloomberg New Energy Finance, 'Global Trends in Renewable Energy Investment 2017,' 2017.
[৭৬] (IRENA) International Renewable Energy Agency. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. 2017. p. 70.
[৭৯] Feldman D., Margolis R., and Denholm P. 'Exploring the Potential Competitiveness of Utility-Scale Photovoltaics plus Batteries with Concentrating Solar Power, 2015–2030,' National Renewable Energy Laboratory, 2016.

	* ২০১৬ সালের মার্চ মাসের তথ্য অনুসারে মেক্সিকোতে প্রতি ইউনিট মূল্য ৩ টাকা ২৪ পয়সা * ২০১৬ সালের মে মাসের তথ্য অনুসারে দুবাইতে প্রতি ইউনিট মূল্য ২ টাকা ৪০ পয়সা *২০১৬ সালের জুন মাসের তথ্য অনুসারে জাম্বিয়াতে প্রতি ইউনিট মূল্য ৪ টাকা ৮০ পয়সা *২০১৬ সালের আগস্ট মাসের তথ্য অনুসারে চিলিতে প্রতি ইউনিট মূল্য ২ টাকা ৩২ পয়সা *ভারতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সর্বশেষ (২৪ নভেম্বর, ২০১৭) তথ্য অনুসারে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ মূল্য ৩ টাকা	* ডিস্ট্রিবিউটিভ স্কেলে সৌর বিদ্যুতের মূল্য প্রতি ইউনিটে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কমেছে ৫৪% ।[৭৭] * ২০১৪ সালে প্রতি ওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল মূল্য দাঁড়ায় ৮০ টাকা যা ২০১০ সালের তুলনায় অর্ধেক ।[৭৮]	*** ২০২৫ সাল নাগাদ প্রতি ইউনিট সৌর বিদ্যুৎ মূল্য বর্তমান দামের থেকে আরও ৫৯% কমবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে ।[৮০]**

[৭৭] US Department of Energy, 'The Future Arrives for Five Clean Energy Technologies – 2016 Update,' 2016.
[৭৮] Feldman D., Margolis R., and Denholm P. 'Exploring the Potential Competitiveness of Utility-Scale Photovoltaics plus Batteries with Concentrating Solar Power, 2015–2030,' National Renewable Energy Laboratory, 2016.
[৮০] (IRENA) International Renewable Energy Agency. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. 2017. p. 70.

বায়ু বিদ্যুৎ	*২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের তথ্য অনুসারে মরক্কোতে প্রতি ইউনিট মূল্য ২টাকা ৪ পয়সা *২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তথ্য অনুসারে পেরুতে ইউনিট মূল্য ৩টাকা *২০১৬ সালের জুলাই মাসের তথ্য অনুসারে নেদার-ল্যান্ডসে প্রতি ইউনিট অফশোর বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ মূল্য ৬ টাকা ৪০ পয়সা *২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের তথ্য অনুসারে ডেনমার্কে প্রতি ইউনিট অফশোর বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ মূল্য ৪ টাকা ৪০ পয়সা * ভারতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সর্বশেষ (২৪ নভেম্বর, ২০১৭) তথ্য অনুসারে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ মূল্য ৩ টাকা ২০ পয়সা	* প্রতি ইউনিট বায়ু বিদ্যুতের (অনশোর) মূল্য ২০১০ থেকে ৬ বছরে কমেছে ২০% ।[৮১] *১৯৮০ সালের অনশোর বায়ু বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য ৫১ টাকা থেকে ৯০% কমে ২০১৫ তে এসে দাঁড়ায় ৫ টাকা ।[৮২]	***২০১৪ সালের তুলনায় ২০৩০ সালে প্রতি ইউনিট অনশোর বায়ু বিদ্যুতের মূল্য ২৫% পর্যন্ত কমে যেতে পারে ।[৮৩]**

[৮১] (IRENA) International Renewable Energy Agency. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. 2017. p.22

[৮২] US Department of Energy, 'The Future Arrives for Five Clean Energy Technologies – 2016 Update,' 2016.

[৮৩] Agora Energiewende (2017): 'Future cost of onshore wind. Recent auction results, long-term outlook and implications for upcoming German auctions,' 2017.

ব্যাটারি	* ২০১৪ সালে প্রতি কিলোওয়াট-আওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারীর দাম ছিল ২৪ হাজার টাকা ।[৮৪] * ২০১৬ সালে প্রতি কিলোওয়াট-আওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির দাম কমে হয় ১৮ হাজার টাকা ।[৮৫]	* লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির মূল্য ২০০৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত প্রতি বছর ১৪% কমেছে ।[৮৬] * ২০১০ সালে প্রতিকিলাওয়াট-আওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির মূল্য ছিল ৮০ হাজার টাকা, ১৬ বছরে ৭৭% কমে ২০১৬ সালে দাম দাঁড়ায় ১৮ হাজার টাকা ।[৮৭]	*২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি কিলাওয়াট-আওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির মূল্য কমে ৮ হাজার থেকে ১৬ হাজার টাকার মধ্যে চলে আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে ।[৮৮]

* প্রকল্পের সময়সীমা এবং সঞ্চালন খরচ অন্তর্ভুক্তির বিবেচনাভেদে খরচের তারতম্য রয়েছে ।

সৌর-পানি-বায়ু শক্তি হতে শতভাগ জ্বালানি চাহিদা পূরণে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্ক জ্যাকবসনের নেতৃত্বে একটি গবেষক দল ২০১১ সাল থেকে চলমান জ্বালানী সংকটের কার্যকর সমাধানে কাজ শুরু করে । সম্প্রতি এই গবেষণার ফলাফল ১০০% Clean and Renewable Wind, Water and Sunlight All-Sector Energy

[৮৪] Feldman D., Margolis R., and Denholm P. 'Exploring the Potential Competitiveness of Utility-Scale Photovoltaics plus Batteries with Concentrating Solar Power, 2015–2030,' National Renewable Energy Laboratory, 2016.

[৮৫] McKinsey&Company, 'Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability,' 2017.

[৮৬] D., Margolis R., and Denholm P. 'Exploring the Potential Competitiveness of Utility-Scale Photovoltaics plus Batteries with Concentrating Solar Power, 2015–2030,' National Renewable Energy Laboratory, 2016

[৮৭] McKinsey&Company, 'Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability,' 2017.

[৮৮] Feldman D., Margolis R., and Denholm P. 'Exploring the Potential Competitiveness of Utility-Scale Photovoltaics plus Batteries with Concentrating Solar Power, 2015–2030,' National Renewable Energy Laboratory, 2016.

Roadmaps for 139 Countries of the World শিরোনামে 'জুল' জার্নালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ব্যবহার সহজলভ্য করার পাশাপাশি জ্বালানি ব্যবহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমানোর উপায় উদ্ভাবন করাই ছিল এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতিটি দেশের ব্যবহার উপযোগী জ্বালানি উৎপাদন সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখার জন্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে GATOR-GCMOM জলবায়ু মডেল। বিদ্যুতের উৎপাদন এবং ব্যবহারের সমন্বয় যাচাই করা হয়েছে LOADMATCH Grid-integration মডেলের মাধ্যমে। এ গবেষণায় যোগাযোগ, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা, কৃষিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রের জ্বালানি চাহিদা বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে মেটানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্যান্য দেশের পাশাপাশি এই গবেষণায় ১০০% Bangladesh শিরোনামে বাংলাদেশের জন্য পৃথক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মদক্ষতা উন্নীতকরণ এবং জ্বালানী সরবরাহের জন্য নিয়ত খনি কার্যক্রম না থাকার কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ চাহিদা সাধারণ অবস্থার তুলনায় ৪৬.৮ শতাংশ কম হবে বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। এখানে বাংলাদেশের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচলিত প্রযুক্তির নিম্নোক্ত 'সমন্বয়' প্রস্তাব করা হয়েছে।

ছক: ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় জ্বালানি চাহিদা শতভাগ মেটানোর লক্ষ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের শতকরা হার এবং উৎপাদন ক্ষমতা[৮৯]

প্রযুক্তি	ব্যবহারের শতকরা হার	২০৫০ সাল নাগাদ উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	নতুন নবায়নযোগ্য অবকাঠামো তৈরীতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ	২০৫০ সালে উৎপাদিত বিদ্যুৎ
বাসাবাড়ির ছাদভিত্তিক সোলার	২৭.৮%	৬৬৬৩৭	৫৫০ বিলিয়ন ডলার (২০১৩ মার্কিন ডলার)	৩৩০.৬ টেরওয়াট-আওয়ার
ছাদভিত্তিক সোলার (বাণিজ্যিক)	৭.৮%	১৯০২৬		

[৮৯] Jacobson et al., 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World, Joule (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2017.07.005, দেশভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যঃ <http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/W-WS-50-USState-plans.html>

সোলার প্ল্যান্ট (ইউটিলিটি স্কেল)	৪০%	৯৪৭২২		
সোলার প্ল্যান্ট (CSP)	১১.৯%	১০৯১৫ (অতিরিক্ত স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৬৫৪৯ মেগাওয়াট, শিল্পক্ষেত্রে তাপ উৎপাদনে সোলার থার্মাল স্টোরেজ ২৮৩৭৫ মেগাওয়াট)		
বায়ু বিদ্যুৎ (Onshore)	৫.৮%	৫৯৪৪		
বায়ু বিদ্যুৎ (Offshore)	৫.৮%	১৩০৭৭		
সামুদ্রিক ঢেউ	০.৫%	১৫৮৪		
জোয়ার ভাটা	০.১%	১৫০		
জলবিদ্যুৎ	০.৩%	২৩০		
জিওথার্মাল	০%	০		
সর্বমোট	১০০%	২১২২৮৫		

এই গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী:

-প্রচলিত জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ২০৫০ সাল নাগাদ ইউনিট প্রতি ৯ টাকা ৪০ পয়সা হবে (২০১৩ সালের দামস্তর অনুযায়ী) ।

-বিপরীতে সৌর-পানি-বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ৫ টাকা ৫৯ পয়সা (ইউনিট প্রতি) হবে ।

-মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার খরচ বছর প্রতি ২ হাজার টাকা করে কমে যাবে ।

-প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশের মোট ১.৫ শতাংশ জায়গার প্রয়োজন হবে । নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সাথে কৃষি কাজ, বসতি স্থাপন সবই করা সম্ভব ।

এমনকি ভাসমান পদ্ধতিতে সৌর এবং বায়ু বিদ্যুৎ করার সুযোগ থাকায় তুলনামূলক বিচারে প্রচলিত জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও খনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন হয় তার চেয়ে শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে উৎপাদন করলে কম জমির প্রয়োজন হবে ।

-এই বিদ্যুৎ উৎপাদনী ব্যবস্থায় সব মিলিয়ে মোট ২ লক্ষ ২৬ হাজার নতুন দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ।

-বছর প্রতি ১ লক্ষ ২৩ হাজার বায়ু দূষণ জনিত মৃত্যু হ্রাস হবে ।

এছাড়াও **যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে'র একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বর্তমান প্রাপ্ত প্রযুক্তিতে শতভাগ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব ১ লক্ষ ২০ হাজার মেগাওয়াট ।**[৯০] ইনস্টিটিউট অব এনার্জি এন্ড ফাইনান্সিয়াল এনালাইসিস এর গবেষণা অনুযায়ী শতভাগ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব ৪০ হাজার মেগাওয়াট । আমেরিকার জার্নাল অব ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অনুযায়ী বায়ু বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে ২০ হাজার মেগাওয়াট ।[৯১]

বাংলাদেশের জন্য জাতীয় কমিটির রূপরেখা

সকল দিক বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ করলে, বিদেশি কোম্পানি ও কনসালট্যান্ট নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে, কোন ধ্বংসাত্মক পথে না গিয়ে শিল্প, কৃষি ও পরিবহনসহ ঘরে ঘরে পরিবেশ সম্মত ভাবে এবং সুলভে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ সম্ভব । সেই লক্ষ্যে আমরা স্বল্প মেয়াদ (২০২১ সাল পর্যন্ত) মধ্য মেয়াদ (২০৩১ সাল পর্যন্ত) এবং দীর্ঘ মেয়াদ (২০৪১ সাল পর্যন্ত) কে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের মহাপরিকল্পনা বিন্যাস করেছি ।

আমরা মনে করি, ঘন জনবসতি, কৃষি ও পানি সম্পদের ওপর এই দেশের মানুষের সামগ্রিক নির্ভরতার কারণে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুতের ঝুঁকি বাংলাদেশে বেশি । তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ

[৯০] (IEEFA) Institute of Energy Economics and Financial Analysis. Bangladesh Electricity Transition: A Diverse, Secured, Deflationary Way Forward. November, 2016. P 22.

[৯১] Amercian Jounral of Engineering Research. Wind Energy Potential In Bangladesh. Vol 5, Issue 7. 2016.
pp. 85-94. RISOE National Laboratory, Denmark. "Wind Assessment over Bangladesh". RISOE. 2007.
Netherland Enterprize Agency. Wind Energy Potential Bangladesh: Baseline Study. April 13, 2017.

উৎপাদন দিনে দিনে আরও ব্যয়বহুল হচ্ছে, ফলে শুধু আর্থিক দিক বিবেচনাতেও কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ আর গ্রহণযোগ্য থাকছে না।

প্রাকৃতিক গ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানীর মধ্যে সবচাইতে কম দূষণ সৃষ্টি করে, তাই পরিবেশসম্মতভাবে এর উত্তোলন বাংলাদেশকে বেশ কয়েক দশক ধরে সুলভ ও নিরাপদ বিদ্যুতের যোগান দিতে পারে। তবে তা যথেষ্ট হবে না। গত এক দশকে বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বায়ু, মাটি ও পানি দূষণ না করে, কোনো দুর্ঘটনার ঝুঁকি না রেখে, মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর দীর্ঘমেয়াদী হুমকি সৃষ্টি না করে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়াও এই প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের কারণে এর খরচও প্রচলিত জ্বালানীর চাইতে কমে যাচ্ছে।

জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে পরস্পরের স্বার্থে সম্মানজনকভাবে সকল দেশের জনগণের স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগ আছে। বিশেষ করে নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক হতে পারে। ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানীর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণকেও আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব।

স্বল্পমেয়াদে (২০২১ সাল পর্যন্ত): আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিদ্যমান কাঠামোতে অল্প পরিবর্তনের সুপারিশ করেছি। তবে এই সময়ে আমাদের মূল প্রস্তাবনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনসহ জাতীয় কমিটির ৭ দফা বাস্তবায়ন (পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের মধ্যে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করে জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে বিপুল গবেষণা ও নিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। স্থলভাগ ও সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্সকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানীর পথে অগ্রসর হতে সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এই সময়ের প্রধান করণীয়। ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবিত কাঠামোতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে **গ্যাস থেকে শতকরা ৫৯ ভাগ**, তেল থেকে শতকরা ১৯ ভাগ, **নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে শতকরা ১০ ভাগ (৫% সৌর, ৩% বায়ু এবং ২% বর্জ্য)** এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা থেকে আসবে শতকরা ৭ ভাগ বিদ্যুৎ।

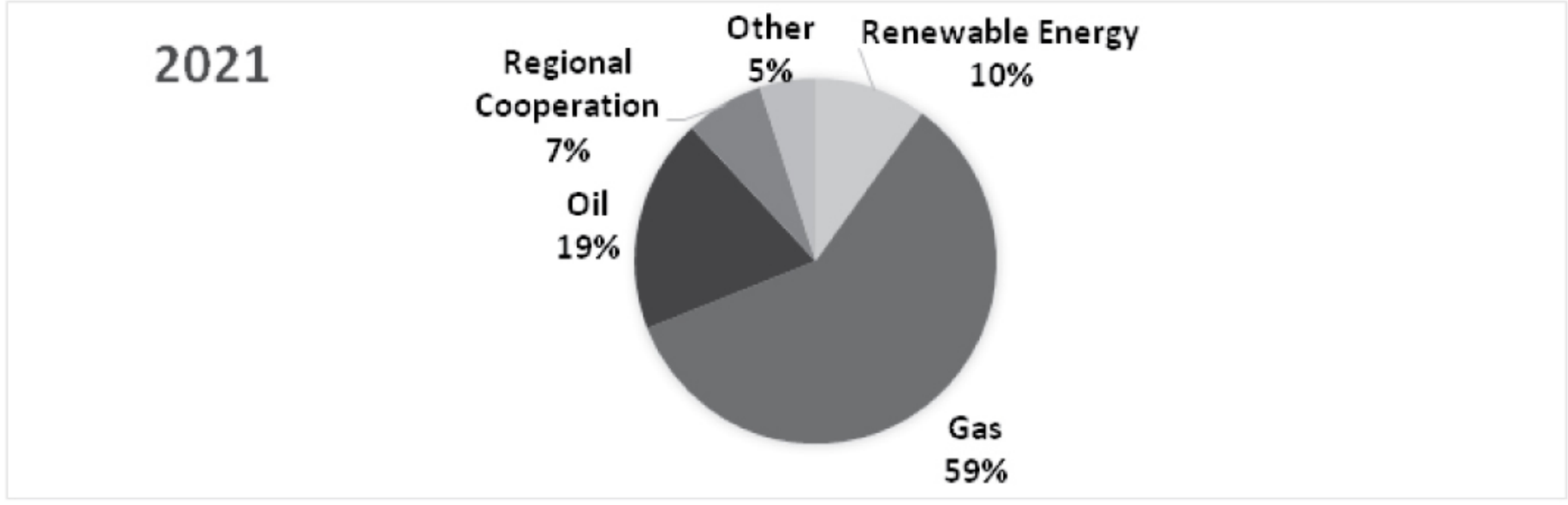

মধ্যমেয়াদে (২০৩১ সাল পর্যন্ত): পুরনো গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস পাওয়ার হার হ্রাস পেলেও যথাযথভাবে অনুসন্ধান করলে গভীর ও অগভীর সমুদ্র থেকে নতুন পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে। কোনো কারণে তার ঘাটতি দেখা দিলে গ্যাস আমদানিও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে। এছাড়া ততদিনে নবায়নযোগ্য উৎসগুলো ব্যবহারের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

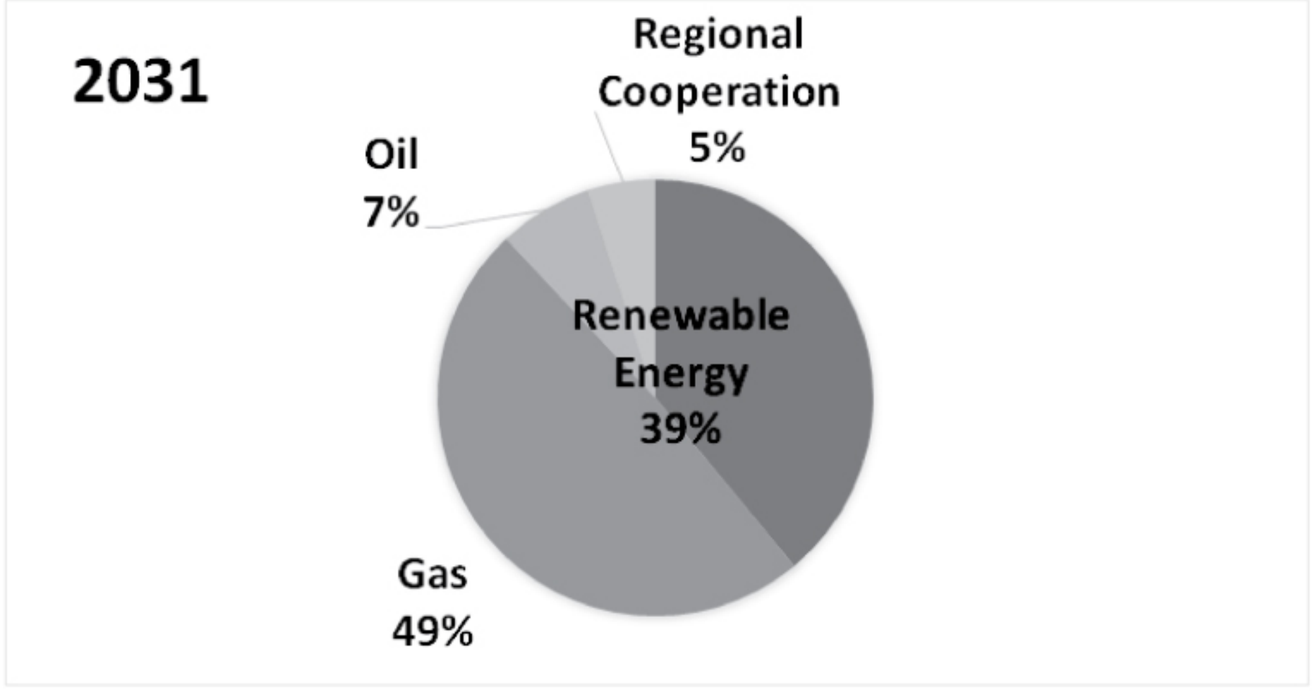

স্বল্পমেয়াদে নির্মিত নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের মাত্রা স্পষ্ট করা সম্ভব হবে মধ্যমেয়াদে। এই সময়কালেও **গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ শীর্ষস্থানে থাকবে, শতকরা ৫২ ভাগ**। দ্বিতীয় স্থানে থাকবে **নবায়নযোগ্য জ্বালানী, শতকরা ৩৫ ভাগ (২৪% সৌর, ৭% বায়ু, ৪% বর্জ্য)**, তেল শতকরা ৮ ভাগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা শতকরা ৫ ভাগ।

দীর্ঘমেয়াদে: দীর্ঘমেয়াদে গুণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করে নবায়নযোগ্য উৎস থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে। সেজন্য **২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আনা সম্ভব হবে (এর মধ্যে সৌর: ৪২%, বায়ু: ৮%, বর্জ্য: ৫%)**। দ্বিতীয় স্থানে থাকবে প্রাকৃতিক গ্যাস, শতকরা ৩৭ ভাগ, তেল ও আঞ্চলিক সহযোগিতা শতকরা ৮ ভাগ।

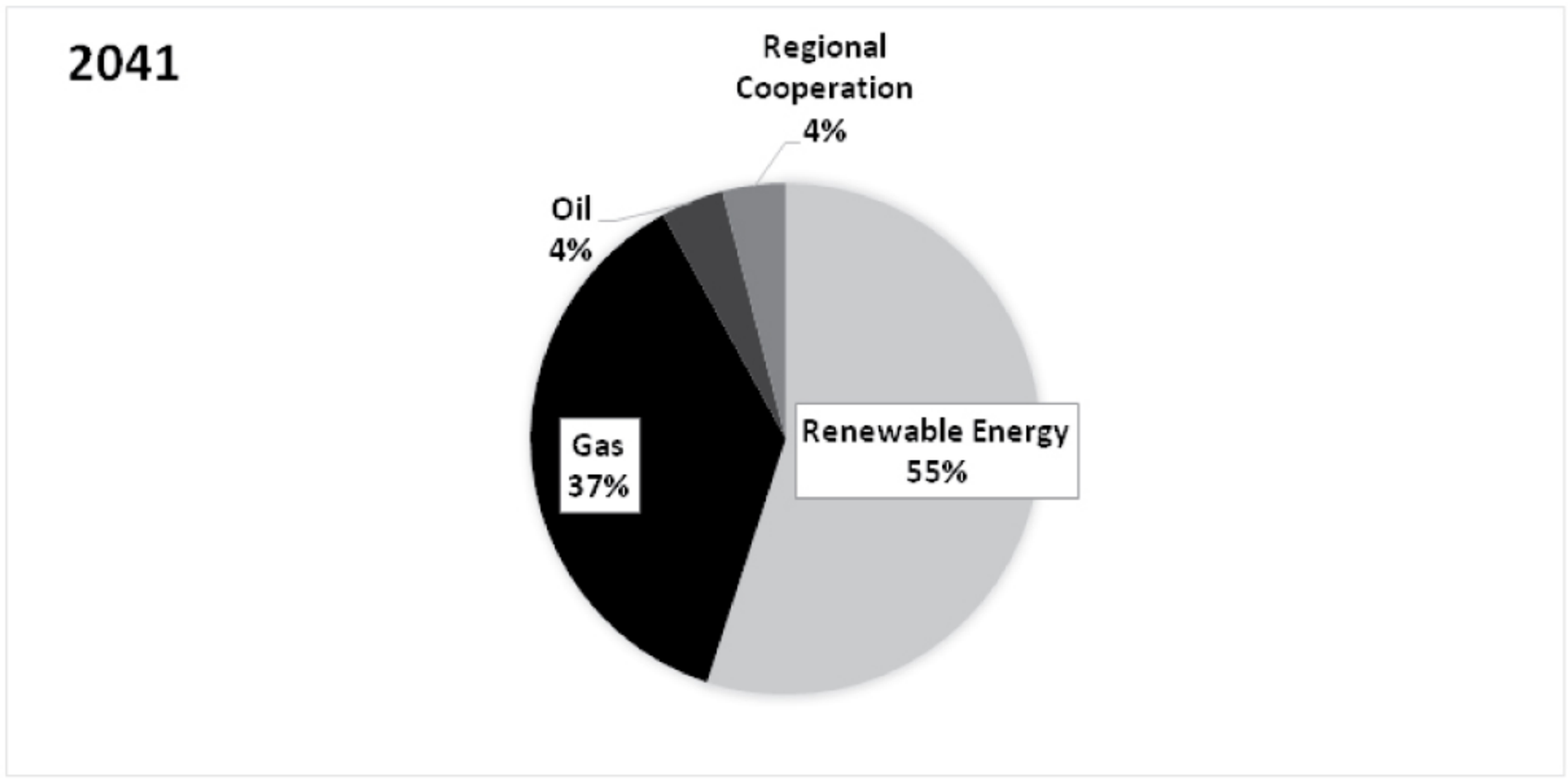

প্রযুক্তির বিকাশের যে গতি আমরা দেখছি তাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের

সুযোগ যে আরও সুলভ, সহজ এবং সম্প্রসারিত হবে তা নিশ্চিত বলা যায়। সেজন্য এই গতিতে অগ্রসর হলে কয়েক দশকের মধ্যেই সারা বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আনা সম্ভব হবে। তাতে সারাবিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত, বিদ্যুতায়িত, সুস্থ, নিরাপদ, বিকশিত দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে।

সরকার ও জাতীয় কমিটির তুলনামূলক অবস্থান

সরকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে যেসব বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশই বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির জন্য পরিবেশগত দিক থেকে ভয়াবহ এবং অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। অবিশ্বাস্য একগুঁয়েমী নিয়ে সরকার সুন্দরবনবিনাশী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কাজ করছে। ভারত ও চীন নিজ নিজ দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে দ্রুত সরে আসার নীতিগত, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাদের পরিত্যক্ত প্রযুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে তৈরি করা হচ্ছে আত্মঘাতী সব প্রকল্প। সম্প্রতি সরকার আবারও রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের পথে যাচ্ছে এবং এর জন্য পুঁজি যোগান দিতে ব্যাংকগুলোর ওপর চাপ দেয়া হচ্ছে।[৯২]

সবরকম তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এসব পথ অপরিহার্য নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবশেগত বিচারে এর চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট পথ আছে। আমরা সেই রূপরেখাই এখানে হাজির করেছি।

ছক: সরকার ও জাতীয় কমিটির মহাপরিকল্পনার তুলনামূলক অবস্থানের চিত্র

বিষয়	সরকারের কর্মসূচি[৯৩]	জাতীয় কমিটির বিকল্প প্রস্তাব
২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ লক্ষ্যমাত্রা	২৪৫ টেরাওয়াট-আওয়ার	২৪৫ টেরাওয়াট-আওয়ার
মূল বৈশিষ্ট্য	আমদানি ও রাশিয়া- চীন-ভারতের ঋণনির্ভর। পরিবেশবিধ্বংসী।	দেশের সম্পদ নির্ভর। রাশিয়া-চীন-ভারতের ঋণমুক্ত। পরিবেশ অনুকূল।
বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস	কয়লা, এলএনজি ও পারমাণবিক	প্রাকৃতিক গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী

[৯২] বণিক বার্তা, ১ জুলাই, ২০১৭

[৯৩] GOB. "The Study for Master Plan on Coal Power Development in the People Republic of Bangladesh." PSMP 2016. Prepared by JICA. 2016. P. 7-26 11-33.

মূল চালিকা শক্তি	বিদেশি কোম্পানি, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, কনসালট্যান্ট	জাতীয় সংস্থা, দেশি প্রতিষ্ঠান ও জনউদ্যোগ
২০২১ সাল পর্যন্ত	মোট: ২৩৫০০ মেগাওয়াট। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস: ৩৪%, এলএনজি: ১১%, কয়লা: ৩০%, তেল: ১৫%, আমদানি/ নবায়নযোগ্য: ১০%	মোট: ২৫২৫০ মেগাওয়াট: ১৪০৬৩ মে.ও. প্রাকৃতিক গ্যাস. ৪৩৪০ মে.ও. তেল, ২৭৫৯ মে.ও. সোলার, ৯৯৩ মে.ও. বায়ু, ৩৯৭ মে.ও. বর্জ্য, ১৫৯৯ মে.ও. আঞ্চলিক সহযোগিতা, ১০৯২ মে.ও. অন্যান্য। **জ্বালানীর ভিত্তিতে:** প্রাকৃতিক গ্যাস ৫৯%, তেল ১৯%, নবায়নযোগ্য ১০%, অন্যান্য ১২%
২০৩১ সাল পর্যন্ত	মোট: ৩৪৫০০ মেগাওয়াট। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস: ১৩%, এলএনজি: ১৭%, কয়লা: ২৬%, তেল: ১৫%, আমদানি/ নবায়নযোগ্য: ১৫%, পারমাণবিক: ১৪%. তেল: ১৫%	মোট: ৪৯৭০০ মেগাওয়াট: ১৮৪৫৯ মে. ও. প্রাকৃতিক গ্যাস. ২৬৩৭ মে.ও. তেল, ২১০১৫ মে.ও. সোলার, ৩৯৯৫ মে.ও. বায়ু, ১৭১২ মে.ও. বর্জ্য, ১৮৮৪ মে.ও. আঞ্চলিক সহযোগিতা। **জ্বালানীর ভিত্তিতে:** প্রাকৃতিক গ্যাস ৪৯%, নবায়নযোগ্য ৩৯%, অন্যান্য ১২%
২০৩১ সাল পর্যন্ত	মোট: ৫৭০০০ মেগাওয়াট। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস: ১১.৩%, এলএনজি: ২৩.৭%, কয়লা: ৩৫%, তেল: ১৫%, আমদানি/নবায়নযে-াগ্য: ১৫%, পারমাণবিক: ১০%. তেল: ৫%	মোট: ৯১৭০০ মেগাওয়াট: ২২৭৬৬ মে. ও. প্রাকৃতিক গ্যাস. ২৪৬১ মে.ও. তেল, ৫৩৩৯৪ মে.ও. সোলার, ৭৪৫৮ মে.ও. বায়ু, ২৭৯৭ মে.ও. বর্জ্য, ২৭৯৭ মে.ও. আঞ্চলিক সহযোগিতা। **জ্বালানীর ভিত্তিতে:** প্রাকৃতিক গ্যাস ৩৭%, নবায়নযোগ্য ৫৫%, অন্যান্য ৮%

বিনিয়োগ/ দাম: তুলনামূলক চিত্র

সরকারি মহাপরিকল্পনায় ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে।[৯৪] উল্লেখ্য, এতে প্রাথমিক জ্বালানী খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সর্বশেষ বাজেটে সরকার রূপপুর সহ বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করেছেন ৩১ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকা। জাতীয় কমিটির বিনিয়োগ প্রস্তাবনায় ব্যাটারি খরচ সহ আগামী ২৫ বছরে প্রয়োজন হচ্ছে সর্বোচ্চ ১১০ বিলিয়ন ডলার।

গ্রাহক পর্যায়ে দামের তুলনামূলক চিত্র

দেশে ২০০৬-০৭ সালে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ছিল গড়ে ইউনিটপ্রতি ২.২৬ টাকা।[৯৫] গত ১০ বছরে কয়েকদফা দাম বৃদ্ধির পর সর্বশেষ হিসেবে এই দাম দাঁড়িয়েছে ইউনিটপ্রতি ৬.৭৩ টাকা।[৯৬]

পিএসএমপি ২০১৬ অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম প্রতিবছর বাড়াতে হবে। **সার্বিকভাবে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিএসএমপিতে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ২.৬ শতাংশ হারে প্রকৃত দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। ২০৩১ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রকৃত দাম ১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।** এর ফলে সরকারি পরিকল্পনায় চলতি দামে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের দাম বাড়বে শতকরা ৭০০ ভাগ।

ছক: সরকার ও জাতীয় কমিটির মহাপরিকল্পনায় গ্রাহক পর্যায়ে দামের তুলনামূলক চিত্র

সময়কাল	সরকারের পরিকল্পনায় বিদ্যুতের গড় দাম (চলতি দামে)[৯৭]	জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিদ্যুতের গড় দাম (চলতি দামে)[৯৮]	সরকারের পরিকল্পনায় বিদ্যুতের গড় দাম (২০১৫ দামস্তর অনুযায়ী)	জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিদ্যুতের গড় দাম (২০১৫ দামস্তর অনুযায়ী)
২০২১	১১.৫৬	৭.৬৫	৮.৫২	৫.২৩
২০৩১	৩১.৯৪	২০.০৭	১১.০২	৫.২৯
২০৪১	৭৯.১৪	৫০.১৯	১২.৭৯	৫.১০

[৯৪] GOB. "The Study for Master Plan on Coal Power Development in the People Republic of Bangladesh." PSMP 2016. Prepared by JICA. 2016. P. 7-26 11-33.
[৯৫] (BPDB) Bangladesh Power Development Board. "BPDB Annual Report 2007-2008." Government of Bangladesh. 2009. p. 6.
[৯৬] প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০১৭
[৯৭] Estimated based on figures provied in PSMP 2016. GOB.
[৯৮] Detailed analysis will be provided in our original research document.

সূত্রঃ সরকারের বিদ্যুতের দামের জন্য পিএসএমপি ২০১৬ পৃ. ২১-৪ (summary, tariff policy: electricity tariff) এবং জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত দামের জন্য প্যানেল বিশ্লেষণ।

জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম হবে এর প্রায় অর্ধেক। ২০১৫ সালের দামস্তর অনুযায়ী, ২০৪১ সালে সরকারি পরিকল্পনায় বিদ্যুতের দাম জাতীয় কমিটি প্রস্তাবিত বিদ্যুতের দামের তুলনায় প্রায় ২গুণেরও বেশি। প্রস্তাবিত রূপরেখায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিএসএমপিতে ব্যবহৃত পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে সৌর ও বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি' প্রদত্ত প্রাক্কলিত আন্তর্জাতিক দামকে অনুসরন করা হয়েছে। তেল ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফার্নেস তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ ও ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুতের গড় মূল্য ধরে, পিএসএমপিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে।

নিরাপদ বৈষম্যহীন সমৃদ্ধির পথযাত্রা শুরু করতে হবে

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ও পানি দূষণ, বনধ্বংস এবং প্রাণবৈচিত্র্য বিনাশ যে ভয়াবহ মাত্রায় পরিবেশ দূষণ ঘটিয়েছে তাতে এই গ্রহের অস্তিত্বই বিপন্ন। পরিস্থিতির ক্রমাবনতির পেছনে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নিয়ে মুনাফামুখি তৎপরতাই প্রধান। এর ফলে কৃষি, পরিবহন, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সবই নানান মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই উন্নয়নের পুরোনো ধারণাটিই এখন বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিরোধের মুখে।

সরকার যখন পশ্চাৎমুখি, লুণ্ঠন ও ধ্বংসমুখি, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক উন্নয়ন চিন্তার অধীনে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তখন গত প্রায় দু'দশকের জনআন্দোলনের শক্তি ও আকাঙ্খার উপর দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যতমুখি, প্রগতি ও সমতামুখি প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক, প্রাণ-প্রকৃতি ও মানুষপন্থী উন্নয়ন চিন্তার কাঠামোতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করছি। বিপুল জনসমর্থিত চিন্তা ও আন্দোলনের ধারায় জনপন্থী মহাপরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন বাংলাদেশে নতুন চিন্তা ও জন আন্দোলনের শক্তিরই প্রকাশ ঘটাচ্ছে। আমরা এই খসড়া উপস্থিত করছি দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে দেশে অগ্রসর উন্নয়ন চিন্তা ও বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবার দিকনির্দেশনা চূড়ান্ত করতে।

আমরা জানি, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা আমরা প্রকাশ করেছি ভবিষ্যতে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে এর

চাইতেও উন্নততর এবং সুলভ কাঠামোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এর সব লক্ষণই বিশ্বজুড়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এর জন্য প্রয়োজন হবে সবরকমের আধিপত্য থেকে মুক্ত মানুষ ও প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন দর্শন। এসবের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন এবং জনগণের মালিকানা ও কর্তৃত্বের বিকাশ সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনগণের শতভাগ মালিকানা, খনিজ সম্পদ রপ্তানি সম্পূর্ন নিষিদ্ধ, জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ ও ফুলবাড়ি চুক্তি কার্যকর করা সহ এই প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই নতুন যাত্রা শুরু করা সম্ভব।

জাতীয় কমিটির জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা প্যানেল

আনু মুহাম্মদ (সমন্বয়কারী), অধ্যাপক বিডি রহমতুল্লাহ, প্রকৌশলী মাহবুব সুমন, প্রকৌশলী মওদুদ রহমান, প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, প্রকৌশলী দেবাশীষ সরকার, গবেষক মাহা মির্জা, অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা এবং ডক্টর তানজিম উদ্দীন খান।

বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: আহবায়ক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

ডক্টর আবদুল হাসিব চৌধুরী: অধ্যাপক, ত্বড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর সাজেদ কামাল: নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, ব্র্যান্ডিস বিশ্ববিদ্যালয়, বস্টন, যুক্তরাষ্ট্র

সৌম্য দত্ত: নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, সমন্বয়কারী, ইন্ডিয়া পিপল সায়েন্স ক্যাম্পেইন, দিল্লী

ডক্টর নজরুল ইসলাম: সিনিয়র ইকোনমিস্ট, জাতিসংঘ

ডক্টর মো: খালেকুজ্জামান: অধ্যাপক ভূতত্ত্ব, লক হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়, লক হেভেন, পেনসিলভেনিয়া

টিম বাকলে ও সাইমন নিকোলাস: ইন্সটিটিউট অফ এনার্জি ইকোনমিক এন্ড ফিনানসিয়াল এ্যানালিসিস

কেনজি শিরাইশি, রেবেকা শার্লি ও ড্যানিয়েল কামেন: নবায়নযোগ্য এবং লাগসই বিদুৎ গবেষণাগার (Renewable and Appropriate Energy Laboratory - RAEL), ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র

পরামর্শ ও সংলাপ

যাদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং/অথবা যাদের গবেষণাকাজ ব্যবহার করা

হয়েছে– বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ: ডক্টর দীপেন ভট্টাচার্য, সুজিৎ চৌধুরী, ইফতেখার মাহমুদ, আরিফুজ্জামান তুহিন, মনজুর আহসান, আনিস রায়হান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ এনভায়রনমন্টে নেটওয়ার্ক (বেন), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ইনস্টিটিউট অব এনার্জি-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) পাঠশালা, বণিক বার্তা, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ও সর্বপ্রাণ সাংস্কৃতিক শক্তি।

Center for Financial accountability, Bank Track, International Coal Network, Waterkeeper Alliance, Center for Food Safety.

অন্যান্য তথ্যসূত্র

Cook, Paul. Design of a Household Human Waste Bioreactor. Stanford University. 2010

(BPDB) Bangladesh Power Development Board. BPDB Annual Report 2014-2015.

Indo-German Development Cooperation. The German solar rooftop experience: Applicability in the Indian context Indo-German Development Cooperation. June 7, 2016. http://mnre.gov.in/.../workshop-gcrt-0870616/german.pdf

Kamal, Sajed. The Renewable Revolution: How We Can Fight Climate Change, Prevent Energy Wars, Revitalize the Economy and Transition to a Sustainable Future. Routledge. 2011.

LAZARD Levelized Cost of Energy Analysis, Version 9, Nov. 2015

Matin A. 'How Long will Rooppur Remain Elusive?' The Daily Star, Dec. 2010

Mirza, Maha. "State-business nexus in Bangladesh. The Case of Asia Energy Corporation and Quick Rental Power Plants." Ongoing Doctoral Research. (2013-2017).

Rahman, Mowdudur. "Energy Planning for Bangladesh: Challenges and Opportunities (Masters Thesis). Department of Energy Science and Engineering. Indian Institute of Technology, Bombay.

Saifullah A.Z.A., Karim M. A., Karim M. R. 'Wind Energy Potential in Bangladesh,' American Journal of Engineering Research, Vol.5, Issue 7, pp-85-94.

(SREDA) Sustainable and Renewable Energy Development Authority. "Energy Efficiency and Conservation Master Plan Up To 2030." Power Division. Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Government of Bangladesh. March 2015.

(SREDA) Sustainable and Renewable Energy Development

Authority.Wind Resource Mapping. Power Division. Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Government of Bangladesh.http://www.sreda.gov.bd/index-.php/site/page/2f45-680b-877b-3ec8-7bdc-f44a-721d-ac4b-1ff8-856c
(SREDA). Municipal Waste To Electricity. Available: Power Division. Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Government of Bangladesh. March 2015. http://www.sreda.gov.bd/index-.php/site/page/6b72-7470-54bd-6140-f5b3-40c8-6b8a-b8e6-cc5c-7aa6
Tilley, Elizabeth; Ulrich, Lukas; Luthi, Christoph; Reymond, Philippe; Zurbrugg, Christin. Compendium of Sanitation Systems and Technologies, 2nd revised edition. 2014.
U.S. Geological Survey-PetroBangla Cooperative Assessment of Undiscovered Natural Gas Resources of Bangladesh, Petroleum Systems and Related Geologic Studies in Region 8, South Asia, U.S. Geological Survey Bulletin 2208-A, 2001.
World Bank. Population Growth Annual(%), Available at: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=BD

পরিশিষ্ট ১: জাতীয় কমিটির ৭ দফা

এক. গ্যাস, তেল ও কয়লাসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদে জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। শতভাগ খনিজ সম্পদ দেশের স্বার্থে সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশ ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদেও সর্বোত্তম মিশ্রন ঘটিয়ে একটি জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করতে হবে। জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরও বিভাগ এবং জাতীয় ভাবে বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এ কাজে প্রবাসী বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে।

দুই. দুর্নীতি ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী তৎপরতার ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত দায়মুক্তি আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। 'খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধ' করার আইন পাস করতে হবে। দায়মুক্তি আইন ব্যবহার করে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথনকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিদ্যুৎ খাতকে দেশি বিদেশি ব্যবসার হাতে জিম্মি করবার বিদ্যমান নীতি, চুক্তি ও

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থেকে দেশকে সম্পূর্ন মুক্ত করতে হবে ।

তিন. রামপাল ও ওরিয়ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সুন্দরবনবিনাশী সকল প্রকল্প বাতিল করতে হবে । সুন্দরবনের ক্ষয়রোধ ও তার পুনরোৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'সুন্দরবন নীতিমালা' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক ও ইউএসএইডের বনধ্বংসী প্রকল্প থেকে সুন্দরবনকে মুক্ত করতে হবে ।

চার. বিশাল ঋণ ও ভয়াবহ ঝুঁকিনির্ভও রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র-র পরিবর্তে সেই স্থানে অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ ঝুঁকিমুক্ত বৃহৎ গ্যাস, বর্জ্য ও সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে । বাঁশখালী হত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে । এস আলম ও চীনা গ্রুপের জালিয়াতি, ভূমিগ্রাস এবং জোরজুলুম বন্ধ করে জনসম্মতির ভিত্তিতে সেই জমিতে গ্যাস, বর্জ্য, সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের বৃহৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে ।

পাঁচ. বেআইনীভাবে বাংলাদেশের কয়লা দেখিয়ে বিদেশে শেয়ার ব্যবসার অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায় করে, এশিয়া এনার্জিকে (জিসিএম) দেশ থেকে বহিষ্কার ও উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি নিষিদ্ধ সহ ফুলবাড়ি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে । বাংলাদেশের আবাদী জমি, পানিসম্পদ, জনবসতি ও পরিবেশ প্রাধান্য দিয়ে খনিজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিতে হবে ।

ছয়. শতভাগ গ্যাসসম্পদ দেশের কাজে লাগানোর জন্য দুর্নীতি নির্ভর ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী পিএসসি বাতিল করতে হবে । পরিবর্তে স্থলভাগে ও সমুদ্রে নতুন নতুন তেল গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে জাতীয় সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সুযোগ, ক্ষমতা ও বরাদ্দ দিতে হবে । প্রয়োজনে সাবকন্ট্রাক্ট ও বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়ে সমতল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ওসুমদ্রসীমার সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন শতভাগ জাতীয় মালিকানায় করতে হবে । এগুলোর উপর ভিত্তি করে গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করবার কাজ শুরু করতে হবে । মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় দুটো গ্যাসক্ষেত্র ধ্বংসের জন্য দায়ী শেভরন ও নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা আদায় করে তা টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করতে হবে ।

সাত. জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও বন্দর নিয়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে যেসব জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি করা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং দায়ী দুর্নীতিবাজ জাতীয় স্বার্থবিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ।

পরিশিষ্ট ২: আরও দুটি প্রশ্ন

সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় বর্ষার দিনে কিংবা রাতের বেলা কী হবে?
সোলার প্যানেল রাতের বেলা এবং বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে না–এটা ধরে নিয়েই সৌর কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ডিজাইন করা হয়। জাতীয় কমিটি প্রস্তাাবিত মডেলেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।

এখানে উল্লেখ্য, যে সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নির্ধারিত সময়টুকু ছাড়া সারা বছরই চলতে পারে, সে সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাধারণ অবস্থায় শতকরা ৮৫ ভাগ সময় সচল থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন করে যেতে পারে। তাই গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সাধারণত ৮৫% কিংবা তার বেশি। ঠিক তেমনিভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ৯০%।

অপরদিকে বাংলাদেশে বছরে গড়ে ৩১০ থেকে ৩১৫ দিন 'রৌদ্রোজ্জ্বল দিন' থাকে এবং দিন প্রতি সূর্যের আলো প্রাপ্তির সময় গড়ে সাড়ে ৪ ঘন্টা থেকে সাড়ে ৫ ঘন্টা। এ কারণে সোলার প্যানেলের ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরও কম। রাতে এবং বর্ষার দিনে সোলার প্যানেল অলস পড়ে থাকবে এবং শুধু রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলোতেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এই বিষয়টি হিসাবে নিয়েই প্রস্তাাবিত মডেলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ধরা হয়েছে মাত্র ২২%। অর্থাৎ ২২% ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরে ৫৩ হাজার ৩৯৪ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার প্যানেল থেকে বছরে ১০৩ টেরাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব (যা ২০৪১ সালের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৪২%)। একইভাবে বায়ু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ধরা হয়েছে মাত্র ৩০%।

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনী ব্যবস্থাকে বাতিল প্রমাণ করতেই 'রাতের বেলা কী হবে', 'বর্ষার দিনে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে কিনা' এই জাতীয় যুক্তি হাজির করা হয়।

এখন ২০৪১ সালের কোনো এক বিশেষ দিনের কথা ধরে নেয়া যাক যেই দিনে ২৪ ঘন্টায় বিদ্যুতের চাহিদা ০.৬৭ টেরাওয়াট-আওয়ার (২০৪১ সালের প্রাক্কলিত চাহিদার হিসাব অনুযায়ী)। প্রস্তাাবনা অনুসারে এই ০.৬৭ টেরাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ চাহিদার ৪২% আসবে সোলার থেকে এবং ৮% আসবে বায়ু বিদ্যুৎ থেকে। যদি ধরে নেই যে, বিশেষ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ওই পুরো দিনেই উৎপাদন-উপযোগী সূর্যালোক এবং বায়ু প্রবাহ পাওয়া গেলো না, সেক্ষেত্রে ওই দিনের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে হবে সিস্টেমে উপস্থিত বাকি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ দিনের মোট ০.৬৭ টেরাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুতের চাহিদা সিস্টেমে উপস্থিত ৩০,৮২১ মেগাওয়াট সক্ষমতার অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো মেটাতে পারবে কিনা? উত্তর হচ্ছে, ঐ সময়ে সিস্টেমে উপস্থিত ৯০% বিদ্যুৎ কেন্দ্রও যদি সচল রাখা যায় তাহলে ওই বিশেষ দিনের সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চাহিদা সৌর এবং বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াই অনায়াসে মেটানো সম্ভব হবে।

পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, ওই বিশেষ দিনে 'পিক ডিমান্ড' (সর্বোচ্চ চাহিদা, যা দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরী হয়) যদি ৫২ হাজার মেগাওয়াটে (পিএসএমপি ২০১৬ এর প্রাক্কলন অনুসারে) পৌঁছে যায় তবে সেই চাহিদাও কী ৩১ হাজার মেগাওয়াটের প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল এবং আমদানী করা বিদ্যুৎ ক্ষমতা দিয়ে মেটানো সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, ঐ বিশেষ দিনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ৫২ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছালেও সিস্টেমে উপস্থিত ৭৮ হাজার মেগাওয়াট-আওয়ার ক্ষমতার ব্যাটারী উপস্থিতির কারণে সেই চাহিদা মেটানোও সম্ভব। তাই ৫২ হাজার মেগাওয়াট পিক ডিমান্ড বিশেষ দূর্যোগপূণ দিনে সোলার এবং বায়ু বিদ্যুৎ ছাড়া মেটানো যাবে কিনা সে প্রশ্ন তোলাও অবান্তর।

তবে নিশ্চিতভাবেই এমন বিশেষ দুর্যোগপূর্ণ দিন (বিদ্যুৎ উৎপাদন-উপযোগী বাতাস এবং সূর্যের আলোবিহীন দিন) সারা বছর জুড়েই থাকবে না। এছাড়াও বর্তমানে এখন আবহাওয়ার গতি প্রকৃতির পূর্বাভাস অনেক আগেই পাওয়া সম্ভব, এবং দিনকে দিন প্রযুক্তি উন্নততর হতে থাকায় পূর্বাভাসও নিখুঁত ও নির্দিষ্ট হচ্ছে। কাজেই পূর্বাভাস অনুযায়ী সিস্টেমে উপস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে প্রস্তুত করে রাখা খুবই সম্ভব। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে দুর্যোগপূর্ণ দিন ছাড়া (কুয়াশাচ্ছন্ন শীতকাল এবং বর্ষাকাল) বছরের অন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে। এর ফলে যে কোনো দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিশ্চয়তার পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সঠিক সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত হবে এবং কর্মদক্ষতা বাড়বে।

সৌর কিংবা বায়ু বিদ্যুৎ দিয়ে কী মিল-ফ্যাক্টরী-কল-কারখানা চালানো যাবে?

গ্রীড লাইনে ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সি মিলিয়ে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করার পর বোঝার কোন উপায় থাকে না যে ঐ বিদ্যুৎ সোলার প্যানেল থেকে সরবরাহকৃত, নাকি কয়লা বিদ্যুৎ থেকে। তাই সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে মিল-ফ্যাক্টরী চলবে না–এমন ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া ডেনমার্ক ২০২০ সালের মধ্যেই প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের শতকরা ৫০ ভাগ, এবং জার্মানী ২০৫০ সালের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের ঘোষণা দিয়েছে। এসব দেশে বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ বেঞ্জ, বা আউডির মত বিশ্ববিখ্যাত গাড়ি নির্মাণ ফ্যাক্টরী বা অন্যান্য বৃহৎ শিল্প কারখানা আছে। স্বভাবতই এই শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।